যুদ্ধাপরাধ বিতর্ক

এবং

কতিপয় বুদ্ধিমান মানুষের গল্প

সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ

যুদ্ধাপরাধ বিতর্ক
এবং
কতিপয় বুদ্ধিমান মানুষের গল্প

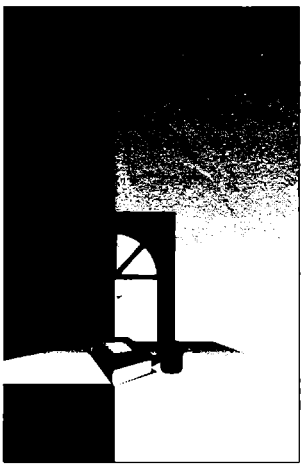

সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ

www.pathagar.com

সংকলক
আবু মোহসিনা ফেরদৌস

প্রকাশক
সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ
৩৮০/বি, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা

মুদ্রণে
সালসাবীল
৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৬৮৪৫

দর্জি, অন্তর্বর্তী সরকার এবং অসময়োচিত বিতর্ক ৫
সিরাজুর রহমান

বর্তমান বাস্তবতা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ৯
সৈয়দ আবুল মকসুদ

কাদের বিচারের কথা কারা বলছে? ১৪
ইত্তেফাক রিপোর্ট

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার গৃহবিবাদের সৃষ্টি করতে পারে ১৭
এবনে গোলাম সামাদ

ওরা আবার সমাজ সুস্থিরতা ধ্বংসের কাজে নেমেছে ২০
দূরবীন

যুদ্ধাপরাধ ও স্বাধীনতাবিরোধী প্রশ্নে শূন্যে গদা ঘুরানো হচ্ছে ৩০
দূরবীন

লালা লাজপত ও দেশবন্ধু যা জানতেন জিল্লুর শাহরিয়ার কবির তা জানেন না ৪১
দূরবীন

গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র আর আমাদের চলতি তন্ত্র ৪৬
মিনার রশীদ

স্বাধীনতার বিরোধিতা এবং যুদ্ধাপরাধের শাস্তি ৫১
মোঃ নূরুল আমিন

ময়না তদন্ত ঃ এক-এগার ৬৪
মাহমুদুর রহমান

ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তরালে ৮৬
মাহমুদুর রহমান

স্বাধীনতার সংকট ৯৩
আহমদ ছফা

www.pathagar.com

জাগো, বস্তিওয়ালা জাগো!!

বাংলাদেশের জনগণ কখনো সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়নি। তবে তাদের জীবনে কখনো কখনো পরাজয় এসেছে ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের পেছন দরজা দিয়ে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর ঘটনা এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ১৬৯০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি জাহাজ এসে ভিড়লো সুতানুটী-ডিহি কলকাতা-গোবিন্দপুর গ্রামের স্যাঁত স্যাঁতে জলাভূমিতে। এর পর তারা কুঠি তৈরি করে কলকাতা-কাশিমবাজার-জাহাঙ্গীরনগরে। সবখানে ছিল তাদের নায়েব-বেনিয়ান-গোমস্তা কর্মচারীরা একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক। ১৬৯০ থেকে ১৭৫৭ সাল। সাতষট্টি বছর ধরে এই গোষ্ঠীটির সাথে তাদের নানা প্রকার লেনদেনের মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক জোট গড়ে ওঠে। এভাবেই বাংলায় সাড়ে সাতশ' বছরের মুসলিম শাসন ধ্বংসের ক্ষেত্র তৈরি হবার পর তারা মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন শিখন্ডী তালাশ করে। মুরশিদাবাদে জগৎ শেঠের বাড়িতে যৌথ বৈঠকের পর পলাশী যুদ্ধের মাত্র আঠারো দিন আগে দলে ভিড়ানো হলো ইতিহাসখ্যাত তৎকালীন মীরজাফরকে। এর পর ২৩ জুন পলাশীতে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলাহর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী এক অভিনব প্রহসনের কাছে নির্মমভাবে পরাজিত হয়।

এই পরাজয়ের দৃশ্য অবাক চোখে দেখেছিল পাশের জমিতে কাজে রত কৃষকরা। রাজনৈতিকভাবে অসচেতন এই জনতা সেদিন বোঝেনি এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী পরিণতি। এর পর দু'শ ইংরেজ সৈন্য ও পাঁচশ' দেশীয় সৈন্য নিয়ে লর্ড ক্লাইভ বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন মুরশিদাবাদে। মুরশিদাবাদের রাস্তার দুই পাশে সমবেত হাজার হাজার মানুষ অবাক হয়ে এই ঘটনা দেখলো। অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে তারা ইতিহাসের এই মোড় পরিবর্তনের ঘটনার সাক্ষী হলো। এ যেন এক তামাশা। ক্লাইভ নিজেই এ প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন ঃ এই সমবেত জনতা শুধু লাঠি আর ইট-পাটকেল মেরে এই নতুন বিজেতাদেরকে সেদিন মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারতো।

এর পর মুরশিদাবাদের মূল্যবান ধনভান্ডার দু'শ নৌকা ভর্তি করে কলকাতায় পাচার হলো। আর তখন মুরশিদাবাদের লোকেরা চোখ

www.pathagar.com

কচলাতে কচলাতে উপলব্ধি করলো, ঘটনা কিছু একটা ঘটে গেছে। সে ঘটনার জের হিসেবে একটানা একশ' নব্বই বছরের গোলামির ঘানি টানতে হয়েছে এ জনপদের মানুষকে।

অন্য রকম ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিলো ১৮৩১, ১৮৫৭, ১৯৩৭, ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৬৫, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১-এ। এর পরের দু'টি ঘটনা ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ও ১৯৮১ সালের ৩১ মে তারিখের। এসব ঘটনা প্রমাণ করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন জনগণের ইস্পাত কঠিন ঐক্যই পারে স্বাধীনতা অর্জন নিশ্চিত করতে এবং সচেতন জনগণের ঐক্যই জাতির সে কষ্টার্জিত স্বাধীনতার সবচে' গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা কবচ।

জাতি আজ আবার এক নতুন সংকট-সন্ধিক্ষণে। দেশের রাজনৈতিক পাটাতন আজ লন্ডভন্ড। জনগণকে সংহত ঐক্যের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেয়ার শক্তিগুলো অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ও অকেজো। এই শূন্যতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিতে বাংলাদেশের অস্তিত্বের দেশী-বিদেশী পুরনো শত্রুরা আজ আবার নতুন করে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। তাদের সহযোগী ও দালালরূপে 'শ পাঁচেক বুদ্ধিমান' শিখন্ডীও যোগাড় হয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে জনগণকে সচেতন করার জন্য আমাদের দেশের বেশ ক'জন কলামিস্ট তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সময়োচিত ভূমিকা পালন করছেন। জাতীয় ঐক্যের প্রতিপক্ষ ও জাতীয় অস্তিত্বের শত্রুদের চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে মনে করে এখানে তাঁদের লেখা থেকে ক'টি কলাম সংকলিত করা হলো।

আমাদের আবেদন ঃ আসুন, আমরা সময়মতো সচেতন হই এবং আমাদের এই প্রাণপ্রিয় দেশটিকে ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে রক্ষা করি। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের অগ্রযাত্রাকে অক্ষুণ্ন রাখি এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় জাতীয় পতাকাকে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়বদ্ধ হাতে আরো ঊর্ধ্বে তুলে ধরি। আমরা সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ থাকলে কেউই আমাদের গতি-অগ্রগতি রুখতে পারবে না।

-আবু মোহসিনা ফেরদৌস

www.pathagar.com

দর্জি, অন্তর্বর্তী সরকার এবং অসময়োচিত বিতর্ক

।। সিরাজুর রহমান।।

দর্জি আর অতিচালাক খদ্দেরের গল্পটা নিশ্চয়ই আপনাদের অনেকের জানা আছে।
দর্জির কথামতো শার্ট তৈরি করানোর জন্য তিন গজ কাপড় কিনেছিল খদ্দের। বন্ধুরা বললো দর্জি কাপড় চুরি করে। অতিচালাক খদ্দের দর্জির চুরি ধরে ফেলার সঙ্কল্প নিয়েই তার দোকানে গিয়েছিল।
দর্জিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, জামা ছাড়া একটা রুমালও হবে?
দর্জি বললো, হবে।
একটা টুপি?
হ্যা– বললো দর্জি।
নিজের বুদ্ধির ওপর খদ্দেরের আস্থা বেড়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলো, বৌয়ের একটা ব্লাউজ?
দর্জি ঘাড় নেড়ে সায় দিল।
ছেলের একটা জামা?
তাতেও রাজি হলো দর্জি।
বাড়ি এসে নিজের বুদ্ধিমত্তায় স্ত্রীকে চমৎকৃত করেছিল সে।
নির্ধারিত দিনে ফরমায়েসি জামাকাপড় সংগ্রহ করতে দর্জির দোকানে গিয়ে তার মাথায় বাজ পড়লো। জামাকাপড় সবই বানিয়েছে দর্জি। মায় রুমাল আর টুপি পর্যন্ত। কিন্তু সবই খুদে আকারের।
দর্জি অসহায়ের ভঙ্গিতে বললো, কি করবো হুজুর, আপনি এতো কিছু বানাতে বললেন, কিন্তু কাপড় দিলেন মাত্র তিন গজ।
বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবস্থা অনেকটা সেই অতিচালাক খদ্দেরের মতো। নব্বই দিনের মধ্যে একটা নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন করার আর সে মেয়াদের মধ্যে প্রশাসনের নৈমিত্তিক কাজকর্ম নির্বাহ করার দায়িত্ব নিয়ে ১১ জানুয়ারি তারা ক্ষমতায় এসেছিলেন। নির্বাচন কমিশন আর দুর্নীতি দমন কমিশন তারা নতুন করে গঠন করলেন। মানুষ প্রশংসা করলো। লোভী বালকের গোগ্রাসে সন্দেশ গেলার মতো করে দেশবাসীকে আরো খুশি করার আশায় নিত্যনতুন কর্মসূচি তারা ঘোষণা করে চললেন।
সেসব কর্মসূচির তালিকাও কি ছোটখাটো?

দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। রাজনীতির গণতান্ত্রিকরণ করতে হবে। নির্বাচন বিধিমালার সংস্কারও প্রয়োজন। কোন কোন দেশে আইডি কার্ড চালু আছে। চার বছর ধরে ত্রুটিমুক্ত আইডি কার্ড তৈরির চেষ্টায় কয়েক কোটি পাউন্ড খরচ করে বৃটিশ সরকার সে পরিকল্পনা বাদ দেয়ার কথা চিন্তা করছে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেটাও করতে চায়।

এখানেই কি শেষ?

বর্তমান প্রশাসন পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল সেই ইস্ট ইনডিয়া কম্পানির আমলে। পদ্ধতির বার্ধক্যবশত অথর্বতা এসেছে, জঞ্জাল জড়ো হয়েছে সে পদ্ধতিতে। অতএব সংস্কার দরকার। প্রচলিত আইনেরও অনেকগুলো তৈরি হয়েছিল ইংরেজদের আমলে। সেগুলোরও পুনর্বিবেচনা এবং প্রয়োজনবোধে সংস্কার প্রয়োজন। এভাবে আমাদের উচ্চাভিলাষী তত্ত্বাবধায়ক সরকার

www.pathagar.com

সাংবিধানিক দায়িত্বের পরিধি আর সময়ের সীমাবদ্ধতার কথা ভুলে গেলেন। নিত্যনতুন দায়িত্ব চাপিয়ে নিলেন নিজেদের ঘাড়ে। সংবিধান যে মূল দায়িত্বটা দিয়েছিল, সেই নির্বাচন তাদের বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে দাঁড়ালো।

এদিকে দৈনন্দিন কাজকর্মের যে দায়িত্ব সংবিধান তাদের দিয়েছিল সেগুলো কিন্তু সুনির্বাহ হয়নি। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দরকার। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, খুনখারাবি বেড়ে গেছে। মানুষকে খেয়ে বাচতে হবে। খাদ্যদ্রব্য আর নিত্য ব্যবহার্য পণ্যাদির মূল্য সরকার সামালে রাখতে পারছে না। শুনেছি কোনো কোনো উচু মহল থেকে মানুষকে এখন জিনিসপত্র কম করে কিনতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে পেট কি সন্তুষ্ট হবে সে পরামর্শে?

ইংরেজদের আমলে দুর্ভিক্ষ হলে, মানুষ মারা গেলে জেলা কিংবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সে কথা স্বীকার করতেন না। তাতে বিলেতের বড় কর্তারা অখুশি হতে পারেন। সাহেবরা তাই রিপোর্টে লিখতেন, কিছু লোক হাড় শুকনো ব্যাধিতে মারা গেছে। ইনডিয়ান লেখক সা'দৎ হোসেন মিন্টো সে কাহিনী অমর করে গেছেন।

অর্থনীতির অব্যবস্থা

বাংলাদেশে এখনো সে রকম অবস্থা হয়নি। কিন্তু সরকার হালে পানি পাচ্ছে না। তারা প্রথমে ব্যবসায়ীদের, পরে ব্যাংকগুলোর ওপর দোষ চাপালেন। বিডিআরকে মুদিগিরির দায়িত্ব দেয়া হলো। এখন আবার ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য আইন হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে শিগগিরই খাদ্যমূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে নামিয়ে আনা না গেলে হাড় শুকনো ব্যাধি বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাও কমছে একই সঙ্গে। অর্থনীতির অবস্থা সত্যি খারাপ। নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। কয়েকটা পাটকল বন্ধ এবং কর্মী ছাটাই করা হয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে হকার, বস্তি আর অবৈধভাবে তৈরি দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে। সাড়ে চার লাখ মানুষ বেকার হয়েছে তাতে। মুদ্রাস্ফীতির হার ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। অপরিকল্পিতভাবে কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে বাজারে টাকা নেই। নিম্নবিত্ত মানুষের আয়-উপার্জন কমেছে। বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে। এ পরিস্থিতিতে সরকারের সংস্কার পরিকল্পনার ফিরিস্তি শুনে দেশের মানুষের পেট ভরবে না।

দেশের মানুষ নির্বাচন চায়, গণতন্ত্র চায়। সাহায্যদাতা দেশ আর সংস্থাগুলোও নির্বাচন করার জন্য চাপ দিচ্ছে। অবশ্য তাদের চাপ দেশের মানুষের দাবির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সরকারের বিবেচনায়। সরকার তাই ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। একটা রোড ম্যাপও তৈরি হয়েছে সে জন্য। লক্ষণীয় যে, এ রোড ম্যাপে সংসদ নির্বাচনের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে পৌরসভা নির্বাচনকে। সংবিধান কিন্তু সংসদ নির্বাচনকেই তাদের মূল দায়িত্ব বলে নির্দেশ করেছে।

সরকার এখন স্বীকার করে নিয়েছে এ সময়সীমার মধ্যে দুর্নীতি দমন হবে না। আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেন প্রকাশ্যেই বলেছেন, দুর্নীতি যেভাবে সমাজের স্তরে স্তরে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে সম্পৃক্ত হয়েছে তাতে পাঁচ বছরেও দুর্নীতি নির্মূল করা যাবে না। এখন সাব্যস্ত হয়েছে পালের গোদা গোছের কিছু লোকের বিচার করেই আপাতত বিরতি দেয়া হবে। অথচ এ পরামর্শ অনেকে তাদের গোড়াতেই দিয়েছিল।

www.pathagar.com

কাঠগড়ায় বিশ্বাসযোগ্যতা

অন্য যেসব উচ্চাভিলাষী সংস্কারের লক্ষ্য তারা ঘোষণা করেছিলেন সেগুলোকেও অসমাপ্ত রেখে কিংবা আধাখেচড়া গোছের কিছু করে ছেড়ে দিতে হবে– অবশ্য যদি সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া তাদের পরিকল্পনা না হয়। পরিণতিটা দর্জির দোকানের সে উচ্চাভিলাষী অতিচালাক খদ্দেরটির মতো হতে বাধ্য।

প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্কার এসেছে কি? অথবা সরকারি দফতরে নিয়ম-কানুনে? রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের নামে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ১১ জনের একটা অনির্বাচিত সরকার বলে দিতে চায় গণতন্ত্র কারা পরিচালনা করবেন এবং দলগুলোর নেতা কারা হবেন। বিনা প্রয়োজনে জামিন দিতে অস্বীকার করে প্রধান দুটি দলের নেত্রী দুজনকে জেলে পুরে রাখা হয়েছে। তাদের অনুপস্থিতিতে সরকারের গ্রহণীয় কিছু ব্যক্তিকে দিয়ে এ দুটো দলের ওপর নতুন নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়াই লক্ষ্য বলে মনে হয়।

এ কাজে ব্যবহৃত হয়ে নির্বাচন কমিশন তাদের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে বলেই মনে হয়। রাতের আধারে বিশেষ বাহিনীর লোকদের দিয়ে বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির কয়েকজন সদস্যকে বার্ধক্য-পীড়িত সাইফুর রহমানের বাড়িতে আনা হয়। চাপের মুখে অনুষ্ঠিত এ তথাকথিত বৈঠকে 'নির্বাচিত' অস্থায়ী নেতৃত্বকে সংলাপে আমন্ত্রণ করে নির্বাচন কমিশন বিএনপির ভাঙন সুনিশ্চিত করেছে।

এখন থেকে নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগেও কৃত্রিম ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা হবে বলে ধরে নেয়া যায়।

কিন্তু এ কৌশলের ভয়াবহ পরিণতির কথা সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশন ভেবে দেখেনি, যদিও এ ধরনেরই একটা দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসী এখন প্রতিদিন এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখতে পাচ্ছে। পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ নিজের গদি বাচানোর স্বার্থে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকে নেতৃত্বহীন করে এবং আরো নানাভাবে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। এ দুটি সেকিউলার দলের ছত্রখান অবস্থায় রাজনীতির ফাঁকা মাঠটা দখল করে নেয় জঙ্গি ইসলামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলো। পারভেজ মোশাররফের এবং পাকিস্তানের বর্তমান সঙ্কটের আসল কারণ সেখানে। অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কাণ্ডকারখানা থেকে মনে হয় তারা বাংলাদেশকেও একই পথে ঠেলে দিতে চান।

অশুভ বিতর্ক

এখন আবার নীতি ও আদর্শের ধ্বজাধারী কিছু লোক বুঝেই হোক কিংবা না বুঝেই হোক সরকারকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। তারা দাবি করছে এ সরকারকেই একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় রাজনীতিকেও বেআইনি করে যেতে হবে তাদের। স্বাধীনতার মালিক কে, ইতিহাসের মালিক কে– এসব বিবাদ তুলে যারা বাংলাদেশকে রক্তারক্তি, হানাহানিতে লিপ্ত করেছে, আদর্শের নামে অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত ও সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে, তারা এখন নতুন বিতর্ক তুলে অন্তর্বর্তী সরকারের মনোযোগ ভিন্নমুখী এবং নির্বাচনকে অনিশ্চিত করে তুলতে চায়।

একাত্তরের পরে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছিল। খোদ শেখ মুজিবুর রহমান তিন বছর

www.pathagar.com

একচ্ছত্র ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী এবং সাড়ে সাত মাস নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের জুন মাস থেকে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তারা করেননি। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আন্দোলন করে হাসিনা সরকার গঠন করেছিলেন। ধর্মীয় রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার কথাও আওয়ামী লীগের মনে হয়নি। মনে হচ্ছে এখন– যখন একটা অগণতান্ত্রিক, অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আছে।

ছিয়াত্তরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল আমার। স্বাধীনতা বিরোধীদের, যুদ্ধাপরাধীদের কেন তিনি দেশে ফিরে আসতে দিয়েছেন, এ প্রশ্ন আমি তাকে করেছিলাম। তার জবাবটা আজো আমার কানে অনুরণিত হচ্ছে।

তিনি বলেছিলেন, এরা তো বাংলাদেশের মাটিতেই জন্মেছে, আর কোন দেশ এদের গ্রহণ করবে আপনিই বলুন। তাহলে কি করবো আমি? এদের কি আমি বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসবো?

জিয়াউর রহমান আমাকে আরো বলেছিলেন, তাদের যদি বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিতে না পারি এবং জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখি তাহলে প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে নিজের পিঠ বাচানোর চিন্তায় থাকতে হবে। তেমন অবস্থায় দেশের সমস্যাগুলো সমাধানের দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় কখন পাবো? অথচ আপনিও জানেন, দেশের সমস্যা অন্তহীন। তার চেয়ে এদের দেশের ও সমাজের কাজে সম্পৃক্ত করা অনেক নিরাপদ।

গণতান্ত্রিক সমাধান চাই

স্বাধীনতার পরে ৩৬ বছর কেটে গেছে। সে স্বাধীনতার সুফল দেশের মানুষ পায়নি। কারণ এই যে, স্বাধীনতা কার পকেটের সম্পত্তি সে নিয়ে আমরা বিবাদ করেছি, মারামারি করেছি। আমরা আশা করেছি আদর্শের বিতর্ক ধুয়ে পানি খেলে মানুষের পেট ভরবে। ওদিকে বাকি বিশ্ব আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। পাশের দেশ ইনডিয়ার, কাছের দেশ চায়নার দিকে তাকিয়ে দেখুন। চায়নিজরাও পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে আদর্শ নিয়ে কোন্দল করেছে, মাওয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে হাজার হাজার প্রাণহানি হয়েছে। কিন্তু ভুলটা তারা শিগগিরই বুঝতে পেরেছিল। মাও সে তুংকে তারা এখনো শ্রদ্ধা করে কিন্তু তার নীতি ও আদর্শ নিয়ে তারা এখন পরস্পরের মাথা ফাটায় না। মাওয়ের নীতি পরিত্যাগ করে চায়না এখন 'প্র্যাগম্যাটিজমের (বাস্তববাদিতার) পথে চলছে। সে জন্যই চায়না নিকট ভবিষ্যতে এক নাম্বার পরাশক্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারছে। যারা একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে চান, ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করতে চান, তাদের উচিত হবে আগামী নির্বাচনে এ দুটো বিষয়কে ইস্যু করে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা। তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিষয়টার সমাধান হয়ে যাবে। একটা অনির্বাচিত, অগণতান্ত্রিক এবং সীমিত মেয়াদের সরকারকে দিয়ে স্বৈরতন্ত্রী পন্থায় কোনো একটা সিদ্ধান্ত জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।

তাছাড়া এসব অসময়োচিত বিতর্কে পরিস্থিতি ঘোলা হচ্ছে। যে মীমাংসা ৩৬ বছরে হয়নি সেটা আসছে ১২ কিংবা ১৩ মাসের মধ্যে সম্ভব মনে করার কারণ নেই বরং তাতে নির্বাচন অনির্দিষ্টকাল পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

দৈনিক যায়যায়দিন, ২১ নবেম্বর, ২০০৭
লেখক ঃ বিবিসি খ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

www.pathagar.com

বর্তমান বাস্তবতা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি

।। সৈয়দ আবুল মকসুদ ।।

সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়– কথাটি বাঙালির নয়, এটি ইউরোপ থেকে এসেছেঃ আ স্টিচ ইন টাইম সেভ্‌স নাইন। বাংলা প্রবাদ হওয়া উচিত ছিল : সময়ে একটি ফোঁড়ও নয়, কিন্তু অসময়ের হাজার ফোঁড়। কথাটি মনে হচ্ছে কয়েক দিন ধরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার দাবিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। আরেকটি প্রবচনের কথা বাঙালি একবারেই বিবেচনায় আনতে চায় না, তা হলোঃ ভাবিয়া করিয়ো কাজ করিয়া ভাবিয়ো না। এটিও বহিরাগত : লুক বিফোর ইউ লিপ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এমন সব মানুষ কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন, তাতে মনে হচ্ছে যেকোনো দিন গোলাম আযমও এ দাবিতে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দেবেন।

যুদ্ধাপরাধী ও রাষ্ট্রবিরোধীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য।-পরাজিত পক্ষ আত্মসমর্থন করলে যুদ্ধবন্দী হয়। সব যুদ্ধবন্দী যুদ্ধাপরাধী নয়। যুদ্ধবন্দীরা জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মানবিক আচরণ পায়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয় অথবা ক্ষমা করা হয়। যুদ্ধাপরাধী নিয়াজি, রাও ফরমান আলিদের ভারত সরকার ক্ষমা করে দিয়েছে।

একাত্তরে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা বিরোধিতা করেছিল, তারা 'রাষ্ট্রবিরোধী' 'দেশদ্রোহী'। দেশেদ্রোহিতার অপরাধ কঠিন অপরাধ। সে অপরাধে শুধু একাত্তরের ঘাতকদের নয়, পরবর্তীকালের কোনো রাষ্ট্রবিরোধীরও বিচার সম্ভব। যারা একাত্তরে খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ করেছিল, তাদের বিচার করে প্রচলিত আইনেই মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যায়। তবে তা হতে হবে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়; প্রতিহিংসামূলকভাবে নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়ে যারা খুন, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধে লিপ্ত ছিল, তাদের সংখ্যা হাজার হাজার; কিন্তু একজন রাজাকারও ফাঁসির দড়ি গলায় পরেনি- সে এক ভয়াবহ বিস্ময়কর ব্যাপার। কেন একজন অপরাধীকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা গেল না- সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো কেউ নেই। খুনির ফাঁসি দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে আইন-আদালত সব সময়ই ছিল। তা সত্ত্বেও অপরাধীরা ছাড় পেল কিভাবে?

পাকিস্তানি কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেনঃ 'ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে যারা সক্রিয়ভাবে সহয়তা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন।'

শেষ বাক্যটি তিনি বলেছিলেন এ জন্য যে তিনি বিমানবন্দরে নেমেই শুনেছিলেন, অনেকেই প্রতিহিংসার বশে আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছিল। কাদের সিদ্দিকী প্রকাশ্যে

www.pathagar.com

পল্টন ময়দানে স্বাধীনতাবিরোধী বাঙালি, বিহারি প্রভৃতিকে গুলি করে হত্যার যে জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তাতে বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে চূর্ণ হয়ে যায়। সে জন্য অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দেওয়ার ভার তিনি সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখেন।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার একজন প্রধান নেতা মওলানা ভাসানী। স্বাধীনতাবিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তিনি কলকাতা থেকেও বলেছেন, দেশে ফিরে এসেও বলেছেন। ১৯৭২ সালের ৩০ এপ্রিল তিনি শিবপুর কৃষক সম্মেলনে তাঁর ভাষণে বহু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সঙ্গে বলেন : 'এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যারা বিট্রে করেছে, তাদের নাম সন্ধান করে, উপযুক্ত কমিটি নিয়োগ করে- যে কমিটির প্রধান পরিচালক হবেন হাইকোর্টের একজন যোগ্যতম জজ- বিচারের পর যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের নাম ভোটার লিস্ট হতে বাদ দিতে হবে।'

বাহাত্তরের ৯-১০ ডিসেম্বর সন্তোষে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যে জাতীয় সম্মেলন হয়, তাতে এক প্রস্তাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল: 'পার্টি উদ্বেগের সহিত লক্ষ করিতেছে যে বাংলাদেশ সরকার ও তাহার প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিন হইতেই পাকিস্তানি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের কথা বলিয়া আসিলেও উক্ত ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। সকল যুদ্ধবন্দীই ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশে ফিরাইয়া আনার কোনো ইচ্ছা বা কার্যক্রম দেখা যাইতেছে না। শাসক দল যত ঘোষণাই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারই উক্ত যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক।... যুদ্ধাপরাধীরা বাংলাদেশের চরম গণহত্যার জন্য দায়ী। তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবার কোনো এক্তিয়ার বাংলাদেশের জনগণ সরকারকে দেয় নাই।' গণহত্যার নায়কদের বিচারের জোর দাবি মওলানা ভাসানী অব্যাহতভাবে করেছেন। তিনি পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিকদের ৩০ বছর নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞারও দাবি করেন। কিন্তু কোনো যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দালালদের বিচার না হওয়ার মূল কারণ অনেক মন্ত্রী, সাংসদ, নেতা ও বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের সহযোগী ছিল। তাদের বাঁচাতে গিয়ে সকলকেই বাঁচিয়ে দেওয়া হয়।

সেক্টর কমান্ডার ও বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জাতির প্রত্যাশা ছিল অনেক। তাঁরা কি বলতে পারবেন, সে প্রত্যাশার এক শতাংশ তাঁরা পূরণ করেছেন ৩৬ বছরে? মন্ত্রিত্ব, রাষ্ট্রদূত বা উচ্চ সরকারি চাকরি, জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া, প্রকাণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্য করা দোষের কিছু নয়। এগুলো করেও জাতির স্বার্থে কিছু কাজ করা যায়। কয়েক দিন ধরে দেখছি, অনেকেই গোলটেবিলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে জোর বক্তব্য দিচ্ছেন। কিন্তু তারা এত দিন কোথায় ছিলেন? এ দাবি আগে যাঁরা তুলেছেন (যেমন কাজী নূরউজ্জামান বীর উত্তম), তাঁদের তো তাঁরা সহযোগিতা দেননি। তাঁরা তো এ দাবি নিজের থেকেও তোলেননি। আওয়ামী লীগ তুলেছে বলে তাঁরা তুলেছেন। আওয়ামী লীগ নিজের থেকে তোলেনি। কাদের সিদ্দিকী, জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টি তুলেছে বলে আওয়ামী লীগ তুলেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যদি জিল্লুর রহমান সাহেবের নিজের মনের দাবি হতো, তাহলে যেদিন তাঁর দল বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলামকে নমিনেশন দেয়, সেদিন তিনি পদত্যাগ করতেন। বিচারপতি ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের, না পাকিস্তানের পক্ষের-সে খবর এই বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতার নিশ্চয়ই অজানা নয়।

www.pathagar.com

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর যে দল ক্ষমতাসীন হয়, তার এক নম্বর কর্তব্য ছিল যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানিদের দালাল ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা এবং বিচারের মুখোমুখি করা। এটি তাদেরই দায়িত্ব, অন্য কোনো পরবর্তী সরকারের নয়। এ ক্ষেত্রে তারা মোটেই কোনো কাজ করেনি, তা-ও নয়। বাহাত্তরের ২৪ জানুয়ারি জারি করা হয় দ্য বাংলাদেশ কলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস্) অর্ডার, ১৯৭২। ওটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আইন ছিল না, তা ছিল পাকিস্তানিদের যেসব দালাল-সহযোগী হত্যা, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের বিচারের আইন। এক সদস্যের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালও গঠিত হয়েছিল দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজের নের্তৃত্বে। হাজার পঞ্চাশেক অপরাধীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। দালাল আইন দু-তিনবার অ্যামেন্ডমেন্ট বা সংশোধন করা হয় ১৯৭২ সালের ১ জুন ও ২৯ আগস্ট।

দালাল আইনের ভালো-মন্দ দিক নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময়ই বির্তক হয়েছিল। এ আইনের অপ্রপ্রয়োগ হতে পারে, সে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন সে সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের মধ্যে মাওলানা ভাসানী, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান, আবুল ফজল, বিচারপতি এস এম মোর্শেদ, আলীম আল রাজী, এনায়েতুল্লাহ খান প্রমুখ ছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিজেও বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। সে জন্য একপর্যায়ে তিনি সাধারণ ক্ষমাই ঘোষণা করেন। তবে খুন-ধর্ষণের সুনির্দিষ্ট অপরাধীদের তিনি ক্ষমা করেননি। দালাল আইন ও সংবিধানের মৌলিক অধিকার নিয়ে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, যিনি ১৯৭৩-এ আওয়ামী লীগের টিকেটে সাংসদ নির্বাচিত হন, প্রশ্ন তুলে তাঁর পত্রিকাতে লিখেছেন: 'শাসনতন্ত্রের প্রথম সিডিউলে বর্ণিত অপরাপর আইনসহ দালাল আইনকে মৌলিক অধিকার সমূহের আওতাবহির্ভূত করা হয়েছে। দালালদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের জন্য আইনটি বলবৎ রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। দালাল আইনের সাথে মৌলিক অধিকারের সংঘর্ষ অবধারিত কিন্তু দালাল আইনে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ না থাকায় ক্রমাগতভাবে এই আইনের অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই আইনবলে কারো বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন হলেও তিনি মৌলিক অধিকার ও শাসনতন্ত্রের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবেন। সাড়ে ছয় কোটি বাঙালি, যারা সীমান্ত অতিক্রম করেনি, তাদের প্রত্যেকেই দালাল-এ কথা চিন্তা করেন এখন কিছুসংখ্যক লোকও সমাজে রয়েছে। যদি খারাপ ধরনের লোক ক্ষমতায় আসেন তাহলে তাঁরা এই আইনকে অত্যাচার-উৎপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস পাবেন। পরবর্তী সরকার সমূহ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক কর্মীকে হয়রানি করার জন্য এই আইন বলবৎ রাখতে প্রলুব্ধ হতে পারে। ৪৭ অনুচ্ছেদ মোতাবেক এই আইনকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিবর্তন-সংশোধনের নামে আরো কঠোর করারও অবকাশ রয়েছে। আমার মতে, দালাল আইনে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দায়ের করার সময়সীমা নির্ধারণ না করার বিচ্যুতি ভবিষ্যতে সুষ্ঠু রাজনীতি নিশ্চিত করার স্বার্থেই শোধরানো উচিত ছিল।' [ইত্তেফাক, ১৯ নভেম্বর ১৯৭২]

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, লেখাটি ইত্তেফাকে প্রকাশের পর বঙ্গবন্ধু মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। ওই দিন তিনি গণভবনে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনাও করেন। দালালদের ব্যাপারে তিনি যতটা সম্ভব নমনীয় হওয়ার চেষ্টা করেন। দালাল আইন নিয়ে বেশ

www.pathagar.com

কিছু মামলা-মকদ্দমাও হাইকোর্টে ১৯৭২-৭৫ - এ হয়েছিল। বিচারপতি কে এম সোবহানের কোর্টে লুৎফর মৃধা বনাম রাষ্ট্র, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী, বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেইন, বিচারপতি রুহুল ইসলাম ও অন্যান্য বিচারপতির কোর্টে মায়মুননেসা বনাম রাষ্ট্র, মশিউর রহমান যাদু মিঞা বনাম রাষ্ট্র, আবদুর রহমান বকুল বনাম রাষ্ট্র, এ কে এম নাজমুল হুদা বনাম রাষ্ট্র, হাফেজ মওলানা নূরুদ্দিন বনাম রাষ্ট্র প্রভৃতি মামলা ছিল দালাল ও মৌলিক অধিকার বিষয়ক।

দালাল প্রশ্ন সমাধানে বঙ্গবন্ধুর সময়ে যথেষ্ট কাজ হয়েছে। তবে ১৯৭৫ পর্যন্ত স্বাধীনতার পক্ষ এবং পাকিস্তানি দালালদের মধ্যে একটি বিভাজনরেখা ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ও বীর উত্তম জিয়াউর রহমানের সরকার যেদিন কাজী জাফরের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করে, সেদিন মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারের, স্বাধীনতাসংগ্রামী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের পার্থক্য সম্পূর্ণ ঘুচে গেল। ওই কমিশনে মাওলানা মান্নানও ছিলেন, জাহানারা ইমামও ছিলেন। এসব তথ্যে যাঁরা বিব্রত বোধ করছেন, তাঁদের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিঃ সত্যরে লও সহজে।

এখনকার পত্রিকা পড়লে মনে হবে, শুধু মুসলিম লীগ, জামায়াত বা নেজামে ইসলামীর লোকেরাই পাকিস্তানিদের দালাল ছিল। বস্তুত সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যেই পাকিস্তানিদের সহযোগী ছিল। আবদুল হক তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির নামের সঙ্গে বাংলাদেশ হওয়ার পরও 'পূর্ব পাকিস্তান'ই রেখে দেন। অত্যন্ত 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করেছেন। ১৬ ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত না হলে, আর বছরখানেক টিক্কা খাঁরা বাংলাদেশ দখল করে রাখলে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে আজ মানুষ ভিন্ন পরিচয়ে জানত। আওয়ামীলীগ সবচেয়ে বড় দলের একটি এবং তার নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন হয়েছে; সুতরাং তার দায়িত্ব বেশি হওয়ার কথা। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান কয়েক দিন ধরে বলছেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় এখনই', তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজটি এখনই শুরু করা উচিত', 'যুদ্ধাপরাধী ও ধর্মাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিবন্ধন না দেওয়া উচিত' প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিএনপি কোন দিনই কোন ব্যবস্থা নেবে না এবং তা সমর্থনও করবে না। কারণ, তাদের মধ্যে প্রণয় এমন গভীর যে, এক সঙ্গে জোট বাঁধুক বা না বাঁধুক- ক্ষমতায় যাক বা না যাক–কোন দিনই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে না। যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল কাজ বিএনপি বুক ফুলিয় করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ তার নিজের কর্মসূচি নিজে বাস্তবায়ন না করে অন্যকে দিয়ে করাতে চায়। যে কাজটি আওয়ামী লীগ নয়টি বছর ক্ষমতায় থেকে করেনি, তা করার দায়িত্ব হস্তান্তর করছে নয় মাস বয়সী সরকারকে। জাতির জনকের মর্যাদাপ্রাপ্তিসহ যেসব কাজের দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেতারা বর্তমান সরকারের কাছে অর্পণ করছেন, তা সম্পন্ন করতে এ সরকারকে ২৭ বছর সময় দিতে হবে। কেউ দিলে সরকার সানন্দে সে সময় নিবে, তবে জনগণ তত দিন চুপ করে বসে থাকবে কি না?

দেশপ্রেমিকদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান, তারা বলছেন, দালালদের এ দেশে থাকার অধিকার নেই, তাদের এক্ষুণি ফাঁসি দিতে হবে, দালালদের প্রশ্নে সমস্ত জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। এসব উক্তির অর্থ বোঝার সাধ্য আমার মতো মানুষের নেই। কোন যুদ্ধে বিজয়ী শক্তির দায়িত্ব বিরাট। ক্ষমা করার ক্ষমতা শুধু বিজয়ী শক্তিরই থাকে-পরাজিতদের নয়। জাতি

www.pathagar.com

যদি আজ সত্যি ঐক্যবদ্ধ থাকত, তাহলে এর চেহারা হতো অন্য রকম; বিশ্বে মর্যাদা হতো অনেক উঁচুতে। দেশ আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে যদি আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করি, তাহলে ১৪ কোটি মানুষের জীবনে নেমে আসবে অমানিশার অন্ধকার। দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধীদের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন, সেখান থেকে আবার পেছনের দিকে যাওয়া সম্ভব হবে না। কোন সরকারের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তিনি যাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাদের আবার আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না। বিচার মানে আইনের প্যাঁচের মধ্যে যাওয়া; সেখানে সাক্ষীসাবুদ, আসামি-ফরিয়াদি, জেরা-পাল্টা জেরা থাকবে। ৩৬ বছর পর অনেক কিছু প্রমাণ করা কঠিন। নাৎসি বাহিনীর সদস্য কুট ওয়ার্ল্ডহেইম জাতিসংঘের মহাসচিব ও পরে অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। গুন্টার গ্রাস তাঁর অপরাধ স্বীকার করেন এবং মূলধারার সঙ্গেই আছেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একটি মৌলিক প্রশ্ন: একাত্তরে যারা খুন, ধর্ষণ করেছে, সেই অপরাধীদের বিচার আরেকটি প্রশ্ন; পাকিস্তানপন্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ একটি ভিন্ন প্রশ্ন এবং ধর্মপন্থী, বিশেষত ইসলামপন্থী রাজনীতি বন্ধের দাবি সম্পূর্ণ আরেকটি বিষয়। এই সবগুলোকে যাঁরা একাকার করে ফেলেছেন, তাঁরা বিবেচনাপ্রসূত কাজ করছেন না।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতাটি কী তা অন্ধ ও বধির এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি ছাড়া যেকোনো সুস্থ মানুষের অজানা নয়। অর্থনীতি বিপর্যস্ত, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং প্রতিদিন বাড়ছে, তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ্য করে সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রেখে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবন থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে একটি বছর, কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয় - আগামী বছর ভাত জুটবে কি না কেউ জানে না, শিল্প-শ্রমিক বেকার, আন্তর্জাতিক চাপ ও চক্রান্ত সর্বকালের মধ্যে এখন সর্বাধিক, জাতির টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষার সব দায়দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও যৌথ বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত দেশপ্রেমিকেরা শুধু গোলটেবিল বৈঠক করলে জাতির সর্বনাশ অবধারিত।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ নবেম্বর, ২০০৭
লেখক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট

www.pathagar.com

কাদের বিচারের কথা কারা বলছে?

।। ইত্তেফাক রিপোর্ট ।।

দুর্নীতির বিচারে দৃঢ়তা দেখিয়ে বর্তমান সরকার যে সময়ে ঘরে-বাইরে সুনাম অর্জন করে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিশেষ মহল জনগণের দৃষ্টিকে সুকৌশলে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার দাবি তুলে পানি ঘোলা করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই দাবি গণফোরামের নেতা ড. কামাল হোসেনকে রাখতে দেখে অনেকেই অবাক হচ্ছেন। কারণ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়ার বিষয়টি তিনি অন্য অনেকের চাইতে বেশী অবহিত রয়েছেন।

ইতিবৃত্তে তাকালে দেখা যায়, ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার দ্বিতীয় বিজয় বার্ষিকীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বন্দীদের একটা বড় অংশ মুক্তি পায়। ওই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় বলা হয়েছিল, যাদের বিরুদ্ধে দালালির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তারা এর আওতায় আসবে না। সমগ্র দেশের বিভিন্ন জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা ১০১৫ থেকে কমিয়ে করা হয় ১৯৫। তাদের বিচার হয়নি। যদিও প্রকাশ্য জনসভায় বাংলার মাটিতে তাদের বিচার করার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং।

কিন্তু এ ঘোষণা ঘোষণাই থেকে যায়। কারণ, ১৯৭৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির ১৪ এবং ১৫ ধারার অধীনে এই বিচার রহিত করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল তৎকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমেদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সে চুক্তির আলোচ্য দু'টি ধারা নিচে উল্লেখ করা হল।

ধারা ১৪ ঃ এ সম্পর্কে তিন মন্ত্রী উল্লেখ করেন, বিরোধ মীমাংসায় অটলভাবে কাজ করে যাওয়ার তিন দেশের অঙ্গীকারের আলোকে বিষয়টির পর্যালোচনা হওয়া উচিত। মন্ত্রীরা আরো উল্লেখ করেন যে, স্বীকৃতি দানের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সফর করবেন এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে অতীতের ভুলভ্রান্তিকে ক্ষমা ও ভুলে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। একইভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত নৃশংসতা এবং ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে তিনি চান যে, জনগণ অতীত ভুলে যাবে, এবং নতুন করে শুরু করবে এবং বাংলাদেশের জনগণ জানে কিভাবে ক্ষমা করতে হয়।

ধারা ১৫ ঃ পরিহার করার মনোভাবের আলোকে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অতীতকে ক্ষমা ও বিস্মৃত হবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার অনুকম্পা হিসেবে বিচার কাজ না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে দিল্লী চুক্তির শর্তাধীনে পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্দী প্রত্যার্পণের যে কাজ চলছে, তাদের সঙ্গে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকেও প্রত্যার্পণ করা যেতে

www.pathagar.com

পারে।

দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের বাংলাদেশে যারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা ভারতের সঙ্গে শান্তি, সমঝোতা ও বন্ধুত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধাপরাধের বিচার পরিহার করেছিলেন। তখনকার রাজনীতিতে বিশেষ করে যে প্রেক্ষাপটে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাতে এ ধরনের চুক্তির যৌক্তিকতা যে কোন বিবেচক মানুষ স্বীকার করবেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রথম হাইকমিশনার ও ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জেএন দীক্ষিত 'লিবারেশন এণ্ড বিয়ণ্ড' গ্রন্থে দাবি করেছেন, ১৯৭২ সালের জুনে শেখ মুজিব তৎকালীন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসারের সঙ্গে আলোচনায় সকল পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানকে ফেরত দিতে রাজি হন এবং আভাস দেন যে, তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে আগ্রহী নন। মুজিব এই আপস করেছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে। তার মতে, ৪৪০ জন যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ১৯৫ থেকে ১১৮ জনে নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ১১৮ জনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে বাংলাদেশ সরকার গড়িমসি করে।

এ সম্পর্কে জানা যায়, মূলত ভারতের অনাগ্রহের কারণেই বাংলাদেশ পাক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারেনি। তবে ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিচার চেয়েছিলেন। তার সিনিয়র উপদেষ্টা ডিপি ধরও সকল বন্দিকে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে ছিলেন না। ১৯৭৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে দু'দেশের মধ্যে অব্যাহত আলোচনার এক পর্যায়ে তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব এনায়েত করিম দিল্লিতে যান। জানা যায়, ওই সময়ে পিএন হাকসার স্পষ্ট ভাষায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে বলেন, কোন পেশাদার আর্মি অপর পেশাদার আর্মির বিচার আশা করেনা- ভারতের সেনাবাহিনী এই যুক্তিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়না।

ভারতের অনাগ্রহের অবশ্য অন্য কারণও ছিল বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তিকালেই ভারত বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, যুদ্ধাপরাধীদের কোন বিচার হবেনা এবং সকল বন্দিকে ফেরত দেয়া হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর তার কন্যা শেখ হাসিনাও বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনিও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। মূল আসামীর বিচার না করে দালাল বা সহযোগীদের বিচার করতে চাওয়া আইনের চোখে কতটা যুক্তিযুক্ত সে প্রশ্ন সচেতন মহল সঙ্গত কারণেই তুলতে পারেন। এই বিচার এতদিন যারা করেননি তাদের পক্ষ থেকে যখন এ দাবি তোলা হয় তখন তার উদ্দেশ্য নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন জাগে বৈকি! তারা যদি রাজনৈতিক নেতা না হতেন, কখনো ক্ষমতায় না থাকতেন তাহলে এ দাবিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে কারও অসুবিধা ছিলনা। বর্তমান সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। সেই প্রত্যাশাসমূহের মধ্যে এই দাবিকেও একটি উত্তম প্রত্যাশা হিসাবে দেখা যেত।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে তারা যদি সত্যি আন্তরিক হতেন তবে তাদের ব্যর্থতার জন্য

www.pathagar.com

আগে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতেন তারা। আসলে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা আছেন যারা সবসময় সাধারণ মানুষকে আহাম্মক মনে করে থাকেন। তারা মনে করেন, জনগণের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ। তারা অতীতকে ভুলে যায়। অতীতে কারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও বরখাস্তের ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নিয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের কীর্তিগাঁথা এদেশের মানুষ ভুলে যায়নি।

নিজেদের ভুল-ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য নেতারা যদি অনুতপ্ত হতে শেখেন তাহলে সেটাই হবে দেশ, জাতি ও জনগণের জন্য কল্যাণকর। আমরা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব প্রত্যাশা করি। জাতিও সুন্দর ভবিষ্যতের কথা শুনতে আগ্রহী। অতীতের ব্যর্থতার কথা ধামাচাপা না দেয়াই হবে জাতির জন্য মঙ্গলজনক। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা না করাই ভাল। আশার কথা এই যে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনভাবেই এই ফাঁদে পা দিচ্ছেনা।

দৈনিক ইত্তেফাক, ০৬ নবেম্বর, ২০০৭

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার গৃহবিবাদের সৃষ্টি করতে পারে

।। এবনে গোলাম সামাদ ।।

আমি আইনের ছাত্র নই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালে জার্মানির যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অনেক সংবাদ ও আলোচনা পড়েছি। তাই আমার মনে এ সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। আজ আমাদের দেশে মহলবিশেষের পক্ষ থেকে উঠানো হচ্ছে ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় যারা যুদ্ধাপরাধ করেছে, তাদের বিচার করার কথা। তাই আমার মনে বিশেষভাবে জাগছে জার্মানির নুরেমবার্গ (Nuremburg) নামক শহরে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার কথা। যা খুবই বিখ্যাত হয়ে আছে। নুরেমবার্গ শহরে বিচারের জন্য গঠন করা হয়েছিল বিশেষ সামরিক ন্যায়পীঠ (Military Tribunal)। এতে তিন রকমের যুদ্ধাপরাধের বিচার করা হয়েছিল ০১. শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (Crimes against Peace) ; ০২. সাধারণ যুদ্ধাপরাধ (War Crimes) এবং ০৩. মনুষত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ (Crimes against Humanity) ।

শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়, যুদ্ধের পরিকল্পনা করা, পূর্বেকৃত কোনো চুক্তিকে অস্বীকার করা যা যুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করে। সাধারণ যুদ্ধাপরাধ বলতে বুঝায় বেসামরিক লোক হত্যা, নারী ধর্ষণ, লোকালয়ে অগ্নিসংযোগ, বেসামরিক ব্যক্তিদের জোর করে কাজ করানো, বন্দীদের সাথে দুর্ব্যবহার প্রভৃতিকে। আর মনুষত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ বলতে বুঝানো হয়, কোনো একটি বিশেষ ভাষাভাষী জনসমষ্টিকে, মানবধারাকে, অথবা কোনো বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী মানুষকে অথবা ভিন্ন মতাবলম্বীদের নির্মূল করার প্রচেষ্টা। এই বিখ্যাত যুদ্ধাপরাধের বিচারের সময় একজন জার্মান উকিল বলেন এই বিচার হচ্ছে একতরফাভাবে। ট্রাইব্যুনাল বিচার করছে কেবল জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের। হতে পারে তারা করেছেন যথেষ্ট অপরাধ। কিন্তু যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞায় পড়তে পারে অন্যরাও। কিন্তু তাদের কোনো বিচার করা হচ্ছে না। এটাকে ঠিক ন্যায়ের বিধানে পড়ছে বলে ধরা চলে না।

একজন জার্মান যুদ্ধাপরাধী বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেন, যুদ্ধে হেরে যাওয়াটাই সর্বোচ্চ অপরাধ। যুদ্ধে যারা জেতে তাদের অপরাধের কোনো বিচার হয় না। বিচার হয় কেবল তাদের যারা যুদ্ধে হারে। আর একজন জার্মান যুদ্ধাপরাধী বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমরা মনুষত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছি। কিন্তু আমরা অবগত হয়েছি যে, জাপানে ফেলা হয়েছে পরমাণু বোমা। আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় এটা মনুষত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ কি না। নুরেমবার্গের বিচারে বিভিন্ন অপরাধীর বিভিন্ন প্রকার শাস্তি হয়েছিল। একজন পেয়েছিল ছাড়া। যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে নুরেমবার্গের বিচার একটা নজির হয়ে আছে। কিন্তু তাই বলে নুরেমবার্গের বিচারপদ্ধতি পরবর্তীকালে অনুসৃত হতে পেরেছে এমন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরো যুদ্ধ হয়েছে। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় (১৯৫০-১৯৫৩) মার্কিন বাহিনীর হাতে যেসব উত্তর কোরীয় সৈন্য ধরা পড়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল তাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। কারণ কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিততে পারেনি। তাকে করতে হয়েছিল

www.pathagar.com

যুদ্ধবিরতি চুক্তি। আর এটা করার শর্ত অনুসারে উত্তর কোরীয় সব যুদ্ধবন্দীকেই বিনা বিচারে ছেড়ে দিতে হয়।

কোরিয়ার যুদ্ধ খুব ছোট যুদ্ধ ছিল না। এতে মার্কিন সৈন্য হতাহত হয় ১ লাখ ৪২ হাজার। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছিল ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। এই যুদ্ধ চলার সময় যেসব আলজেরীয় মুক্তিযোদ্ধা ফরাসি সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে, ফরাসি সরকার চায় তাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। কারণ আলজেরীয় মুক্তিসেনাদের হাতেও ধরা পড়ে অনেক ফরাসি সৈন্য। আলজেরীয় পক্ষ চায় ফরাসি সৈন্যদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করতে। অবশেষে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের বন্দীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারে বিরত থাকে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ও (১৯৫৯-১৯৭৫) ঘটে অনুরূপ ঘটনা। আসলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে কি হবে না সেটা বহুলভাবে নির্ভর করে যুদ্ধের ফলাফলেরই ওপর।

এখন আমাদের দেশে মহলবিশেষের পক্ষ থেকে ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা তোলা হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে থাকছে অনেক আইনি জটিলতা। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। তাই সাবেক পাকিস্তান ছিল একটি রাষ্ট্র। সাবেক পাকিস্তান বাহিনী ছিল সে রাষ্ট্রের বাহিনী। এই বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অংশ ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে ১৬ ডিসেম্বর। এই বাহিনী পৃথকভাবে বাংলাদেশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধে পরাজিত জার্মান বহিনীকে পৃথক পৃথকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে। যেহেতু পাক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি তাই এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনে বিবেচিত হতে পারে না বাংলাদেশের সাথে পাক বাহিনীর যুদ্ধ হিসেবে। এরপর ১৯৭২ সালে ৩ জুলাই পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে হয় সিমলা চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে বিনা বিচারে ছাড়া পেয়ে যাঁয় সব পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী। প্রশ্ন উঠবে, কেন বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধিকে সিমলা সম্মেলনে ডাকা হয়নি। এর আগে ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা (Genocide) চালিয়েছে। এই গণহত্যা পরিচালিত হয়েছে পাক বাহিনীর প্রধান টিক্কা খানের নির্দেশে। টিক্কা খানের বিচার করা হবে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। কিন্তু সিমলা চুক্তির পর তার এই ঘোষণা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যে কারণেই হোক শেখ মুজিব সরকার যুদ্ধাপরাধীদের আর বিচার চায়নি। কিন্তু এত দিন পরে আজ উঠানো হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি। এ রকম দাবি এখন কেন উঠানো হচ্ছে আমরা জানি না।

এখানে আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৭১ সালে আমি গিয়েছিলাম ভারতের বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনা শহরে বক্তৃতা করতে। আমি সেখানে গিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধে বিহারের জনমতকে অনুকূল করার লক্ষ্যে। কিন্তু এখানে আমাকে পড়তে হয়েছিল কিছুটা বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে। একজন বিহারি সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেন বাংলাদেশে বিহারি হত্যা সম্বন্ধে। তার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পাটনায় আমাকে একটি বাঙালি হিন্দু পরিবার খেতে নিমন্ত্রণও করেন। এই পরিবারটি পাটনায় বাস করছে ইংরেজ আমল থেকে। ওই পরিবারের একজন ব্যক্তি আমাকে খেতে খেতে বলেন, বাংলাদেশ থেকে বিহারি হত্যার যে রকম খবর এখানে আসছে তাতে বিহারিদের হাতে আমাদের

www.pathagar.com

ধন-প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। আমি এ ব্যাপারে তার সাথে বিশদ আলোচনায় যাইনি। আমার মনে পড়ে, ২৯ মার্চ আমি যখন দেশ ছাড়ছিলাম তখন আমাকেও বিহারি বলে মেরে ফেলতে চায় কিছু লোক। আমি নাকি বিহারিদের মতো দেখতে। ভাগ্যগুণে বেঁচে যাই আমি। যুদ্ধাপরাধীদের যদি বিচার করতে হয় তবে নির্মমভাবে বিহারি হত্যার প্রসঙ্গটিও উঠবে। গণহত্যা একতরফাভাবে হয়নি। আমি অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধ করিনি, কিন্তু ঘটনাচক্রে নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম এই যুদ্ধের সাথে। আমাকে লিখতে হয়েছিল গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল নিয়ে প্রবন্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য । কলকাতায় আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত 'জয় বাংলা' নামক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেই আমি। কলকাতার পার্ক সার্কাস নামক জায়গায় একটা গলির মধ্যে অবস্থিত এই পত্রিকার অফিসে আসতেন অনেক ব্যক্তি। পত্রিকার এই অফিস হয়ে উঠেছিল একটা শলাপরামর্শের আখড়া। অনেক কথাই আসত আমার কানে। একদিন শুনতে পাই, আওয়ামী লীগের নেতাদের একটা বিরাট অংশ কলকাতা ছেড়ে যাত্রা করতে চাচ্ছেন ঢাকায়। তারা চান ইয়াহিয়া সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে। কারণ তারা ইচ্ছুক নন পাকিস্তানকে (সাবেক) ভেঙ্গে দিয়ে বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত ভারতের একটা আশ্রিত রাষ্ট্রে (Protectorate) পরিণত করতে। ক'দিন পরে জানতে পারি এদের আশা সফল হয়নি, ভারতের হাতে পড়তে হয়েছে তাদের আটকা।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে এখন যত সহজ করে পড়ানো হচ্ছে আসলে প্রকৃত ইতিহাস তা ছিল না। আওয়ামী লীগের মধ্যে দু'টি ধারা প্রবল হয়ে পড়েছিল। একটি ধারা চিহ্নিত হচ্ছিল ভারতপন্থী হিসেবে, যার নায়ক ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। পক্ষান্তরে আরেক দলকে বলা হচ্ছিল সাবেক পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করার দল হিসেবে। যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ। তখন কেউ ভাবতে পারেনি শেখ মুজিব খুন হবেন তার নিজের দেশের মানুষের হাতে। শেখ মুজিবের মৃত্যু ঘটেছে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলেরই ফলে। এর সাথে আলবদর-রাজাকারদের সুদূর যোগাযোগও নেই। আজ বাংলাদেশে যা প্রয়োজন তা হলো দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ। তা না হলে দেশে বাড়বে চরমপন্থার প্রভাব। দেশ এগিয়ে যাবে ভয়াবহ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে।

১৯৭১-এর পরিস্থিতি আর আজকের বিশ্বের পরিস্থিতি এক নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তখন ভারত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু। আমেরিকা তখন ছিল পাকিস্তানের মিত্র। কিন্তু এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই। ভারত এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরম বন্ধু। ১৯৭১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভুগছিল কমিউনিজমের ভয়ে। সে তখন চাচ্ছিল ইসলাম দিয়ে কমিউনিজমকে রুখতে। কিন্তু আজ তাকে পেয়ে বসেছে ইসলাম-ভীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে করে চলেছে নানা প্রকার চক্রান্ত। যার উদ্দেশ্য হলো বিভেদ সৃষ্টি করে এসব দেশের মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। বাংলাদেশও এসে পড়েছে ইহুদি-নাসারা চক্রান্ত বলয়েরই মধ্যে। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার গভীর বিভক্তি এনে দিতে পারে । যার মাধ্যমে কেবল উপকৃত হবে ভারত ও ইহুদী-খ্রিস্টান চক্রই ।

-নয়া দিগন্ত, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭

লেখক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট

www.pathagar.com

ওরা আবার সমাজ সুস্থিরতা ধ্বংসের কাজে নেমেছে

।। দূরবীন ।।

স্বাধীনতা উত্তরকালে তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত ভারতের আশ্রয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে আনা ও শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে যারা টুঁ শব্দ না করে উল্টো সরকারকেই উৎখাত করার বিপ্লবে লিপ্ত হয়েছিল, সেই বাম ইনু সাহেবরাই আজ অসময়ে তাদের আর এক অনাচারের অংশ হিসেবে শূন্য মাঠে যুদ্ধাপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের সন্ধান করার শ্লোগান তুলে দেশের সামাজিক সুস্থিরতা ধ্বংসের কাজে মেতে উঠেছেন। সে সময়ও তারা বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিখন্ডি হিসাবে কাজ করেছেন, এখনও তাদেরই স্বার্থ সিদ্ধি করছেন। দেশ যখন জরুরি অবস্থার অধীনে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গন যখন সংকট কবলিত, সংকট উত্তরণের উপায় হিসাবে অপরিহার্য জাতীয় নির্বাচনের জন্যে দেশ যখন প্রস্তুত হচ্ছে, তখন নতুন বিতর্ক ও নতুন সামাজিক সংকট সৃষ্টি করার জন্যে ইনু-মেনন সাহেবরা মাঠে নেমেছেন। এই বিভেদ বিতর্ক এবং সামাজিক সংকট বাংলাদেশে সৃষ্টি হোক, এটা চায় বিশেষ কিছু বিদেশী শক্তি। তারা নির্বাচন বানচাল করে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তারা চায় দেশের রাজনীতি বিধস্ত করে দেশকে নেতত্বশূণ্য করতে এবং অর্থনীতির সর্বনাশ করে বাংলাদেশকে তাদের মার্কেট বানাতে। এদেরই সহায়তা করছেন ইনু-মেনন সাহেবরা মৃত, পরিত্যক্ত যুদ্ধাপরাধ ও দালাল ইস্যুকে ৩৬ বছর পর কবর থেকে টেনে তোলার মত আত্মঘাতি কাজের মাধ্যমে। এই বিভীষণরা কারা, কে এবং কিসের বিচার চাচ্ছে, এ বিষয়টা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া খুবই প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। এই সাথে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী যে সামাজিক সম্পর্ক, সমন্বয় ও বাস্তবতার চাওয়াকে সম্মান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা উত্তর সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন এবং সামাজিক ও বাস্তব কারণে দালাল আইন অকার্যকর হয়ে পড়েছিল, সে বিষয়টিও নতুন করে সামনে আসা উচিত বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন। দৈনিক ইত্তেফাকের একটা মন্তব্য প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'কাদের বিচারের কথা কারা বলছে'। কিছু লোকের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি উঠার প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত একটি আলোচনার উক্ত শিরোনাম দেয়া হয়েছে। ইত্তেফাকের আলোচনায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩৬ বছর পর যুদ্ধাপরাধী খোঁজা ও তাদের বিচার দাবির অন্তঃসারশূন্যতার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর যারা একটা অন্তঃসারশূন্য দাবি তুলে পানি ঘোলা করছে, ওরা কেউ অপরিচিত নয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে এদের দেখা গেছে। দেখা গেছে এদের স্বাধীনতা উত্তর সরকারের সাথে সাপে নেউলের মত জঙ্গ রত অবস্থায়। আওয়ামী লীগ ছিল ক্ষমতায় এবং ইনু-সিরাজুল আলমদের নেতৃত্বে এক শ্রেণীর বামরা ছিল বিদেশী ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হিসাবে সরকার উৎখাতের জন্যে বিপ্লব করার প্রচেষ্টায়।

ইনু-মেনন ও তাদের বামসহযোগীরা আজ ৩৬ বছর পর যুদ্ধাপরাধ খুঁজছেন, যুদ্ধাপরাধী খুঁজছেন, কিন্তু সেই স্বাধীনতা উত্তরকালে এ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। এই কাজে তারা সরকারকে কিংবা সরকারের তদন্তে কোন সহযোগিতা করেনি। কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন তারা তখন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলেই ইনু-মেনন-সিরাজুল আলম খানদের কিছুটা

www.pathagar.com

পরিচয় নগ্ন হবে ।

স্বাধীনতা উত্তরকালে যখন দেশ গড়ার সময়, ঠিক সে সময়ই ইনু-সিরাজুল আলমের মত নব্য বামরা বিদেশী ষড়যন্ত্রের পুতুল হিসেবে 'মরার ওপর খাড়ার ঘা' হানার মত দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতির যারা পর্যবেক্ষক, তারা ভালো করেই জানেন ওয়াশিংটন থেকে উড়ে আসা হলান্ডের মানুষ পিটার কাসটারস (পিটার জোসেফ জোয়ান মারিয়া কাসটারস) এবং ফারইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ-এর প্রতিনিধি ল্যারি লিপৎসুলজ ছিলেন নিরেট বিদেশী এজেন্ট। এরা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন সিআইএ-এর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। এরা এসে তাদের লক্ষ্য সাধনে রেডিমেড হিসাবে পেয়েছিলেন ইনু, সিরাজুল আলম খান ও অধ্যাপক আখলাকুর রহমান খানদের। পিটার কাসটারস ও ল্যারিরা চেয়েছিলেন এদেরকে সিআইএ স্বার্থের হাতিয়ার বানাতে। কিন্তু তারা জানতেন না, এরা আগে থেকেই 'র' এর অর্থাৎ ভারতের লোক হয়ে আছেন। বাংলাদেশের শেখ মুজিবের সরকারও সম্ভবত এটা নিশ্চিতভাবে জানতেন না। সেটা নিশ্চিত জানা হয়ে যায় ১৯৭২ সালের এক ঘটনায়। এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন পিটার কাসটারস ধরা পড়ার পর তার জবানবন্দীতে। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে 'র' এর ডিরেক্টর 'আর এন কাও' এসেছিলেন ঢাকায়। তিনি উঠেছিলেন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের (আজকের শেরাটন) সাত তলার এক সুইটে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশ গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালিন প্রধান আহমদ ইব্রাহিমকে কাওয়ের সাথে দেখা করতে বলেন। আহমদ ইব্রাহিম কাওয়ের সুইটে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে রহস্যময় পুরুষ বলে কথিত এক ব্যক্তিকে দেখে অবাক হয়ে যান। কাও তখন বলেন, 'তিনি আমাদের লোক। তাকে সাহয্যের চেষ্টা করুন।' পিটার কাসটারস স্বয়ং ১৯৭৬ সালের মার্চে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এ আর মজুমদারের কাছে দেয়া জবানবন্দীতে এই কথাগুলো বলেন।

বাংলাদেশের রাজনীতির ঐ রহস্যময় পুরুষ এখনও রহস্যময়ই আছেন। তিনি এবং ইনুরা তখনও বাম রাজনীতি করতেন, এখনও বাম রাজনীতি করেন। তবে তারা এখন আগের চেয়ে আরও খোলামেলা হয়েছেন। তারা তাদের নানা ডাল-পালার মাধ্যমে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার কথাও সুউচ্চ কণ্ঠেই বলছেন। এ নিয়ে তাদের প্রকাশনাও আছে, পত্রিকায় খোলা-মেলা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এ বিষয়ে। এ ধরনের একটি সাক্ষাতকার নিয়ে একটি 'প্রচ্ছদ রচনা' প্রকাশ করেছিল সাপ্তাহিক বিচিন্তার ৩১শে জানুয়ারী সংখ্যায়। প্রচ্ছদ রচনাটির শিরোনাম ছিল 'উপমহাদেশের মানচিত্রের আসন্ন পরিবর্তন!' এই শিরোনামের অধীন রিপোর্টে বলা হয়, অযৌক্তিক ও অন্যায় বিভক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় ছিলেন উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত কিছু রাজনীতিবিদ। ..... এসব জ্যেষ্ঠ প্রজন্মের রাজনীতিবিদরা আবার নতুন করে তাদের রাজনৈতিক ও ভৌগলিক স্বপ্ন নিয়ে এগুতে চাইছেন। ফলশ্রুতিতে এতদঞ্চলের প্রত্যেকটি দেশেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাজনৈতিক সাংগঠনিক ঘটনা ঘটছে। এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন'। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক নেতৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সাংগঠনিক নেতৃত্বে যারা রয়েছেন, এরা সবাই প্রথম প্রজন্মে আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

করতেন। পরবর্তীতে রহস্যময় রাজনীতিক জাসদ তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খানের কাছাকাছি ছিলেন এবং এখনও কিছুটা রয়েছেন। .... তাদের পেছনে জাতীয় পর্যায়ের অনেক প্রভাবশালী রাজনীতিকও রয়েছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং জাসদ এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের দু'জন নেতা এই প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই প্রচ্ছদ রিপোর্টে তাদের একটা সাক্ষাতকারও ছিল। সাক্ষাতকারদাতা পরিষ্কার বলেছেন, ভারতের আগ্রহেই এটা হচ্ছে।

ইনু-মেনন-সিরাজুল আলম খানদের এটাই হলো পরিচয়। এরাই 'ভারতের আগ্রহে' সংগঠিত 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন'-এর পেছনের নেতা। এরাই আজ স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর যুদ্ধাপরাধ আর যুদ্ধাপরাধী তালাশ করছেন। এটা তাদের নিছক একটা অজুহাত। এই অজুহাত তোলার লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সবচেয়ে শক্তিশালী রক্ষাকবচ 'ইসলাম' এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তি 'ইসলাম পন্থী' দের দুর্বল করা। এটা ভারত চায় উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে। ইনু-মেনন-সিরাজুল আলম খানরাই স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশ গড়ার আন্দোলন বাদ দিয়ে বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির আন্দোলন শুরু করেন। দেশকে বাকশালের খপ্পরে ঠেলে দেবার নিমিত্ত তারাই। অন্তত স্বাধীনতা উত্তর সরকারের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এই কথাই বলেছিলেন সেদিন জাতীয় সংসদে। তিনি দেশের নৈরাজ্যকর অবস্থার জন্যে বিরোধীদলগুলো বিশেষ করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং গোপন বিপ্লবীদলগুলো এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে দোষারোপ করেছিলেন। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে চারজন সংসদ সদস্যসহ তার দলের হাজারও কর্মীর মৃত্যুর জন্যে সংগঠিত রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে দোষারোপ করেছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, বিরোধী কিছু উপদল গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে সে অস্ত্র দিয়ে লুট ও হত্যার মাধ্যমে তার সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিল। কতকটা এই ধরনেরই একটা কথা বলেছিলেন পিটার কাসটারস তার জবানবন্দীতে। তার জবানবন্দীর এক জায়গায় আছে, '১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মমতাজউদ্দিন খান ঢাকা আসিলে তাহাকে সঙ্গে নিয়া ড. আখলাকুর রহমান সাহেবের বাসায় যাই। ইহার ২/৩ দিন পর মমতাজউদ্দিন আমাকে নিয়া সিরাজুল আলম খানের বাসায় যান। সিরাজুল আলম খান মত প্রকাশ করেন যে, কৃষকদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করতে হইবে এবং এই লাইনে কাজ করিলে তাহার দল জাসদ পার্টি সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে'।

দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা উত্তরকালে ইনুদের বামরা তদানিন্তন সরকারের উৎখাত এবং সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টির কাজে লিপ্ত ছিলেন, যুদ্ধাপরাধের তদন্ত ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে তাদের কোন সহযোগিতা সাহায্য ছিল না। আসলে সরকার কর্তৃক চিহ্নিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার তারা চায়নি। কারণ ভারত চায়নি যে, পাকিস্তানী সৈন্যের ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার হোক। এর পেছনে রহস্য ছিল, সিমলা চুক্তি (২ জুলাই, ১৯৭২) এবং দিল্লী এগ্রিমেন্ট (২৮ আগস্ট ১৯৭৩) অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার মধ্যে বাংলাদেশে ধৃত পরে ভারতের আশ্রয়ে যাওয়া পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীরাও শামিল ছিল। এর বড় প্রমাণ হলো, দিল্লী এগ্রিমেন্ট ধারা-৩ এর ৩ ও ৫ উপধারায় যেখানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে আটকে পড়া মানুষ বিনিময়ের কথা আছে। সেখানে যুদ্ধবন্দীর উল্লেখ নেই। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের উল্লেখ

www.pathagar.com

আছে ধারা-৩ এর উপধারা ১ এবং ২-এ, কিন্তু এ বিনিময়ে বাংলাদেশের ভূমিকার কোন উল্লেখ নেই। অন্যদিকে উপধারা ৬-এ ভারত-প্রতিশ্রুত পাকিস্তানী বন্দী বিনিময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচার না করার বাংলাদেশের সম্মতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ সম্মতি বাংলাদেশ কখন দিল সেকথার কোন উল্লেখ নেই।

উল্লেখ্য, দিল্লী এগ্রিমেন্টটি সিমলা চুক্তির মতই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, বাংলাদেশের মতামতের তোয়াক্কা না করেই ভারত পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের চুক্তি করেছিল। যদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে এইভাবে ভারতের ইচ্ছাটি প্রধান হিসাবে কাজ করেছে। ইনু-মেনন-সিরাজুল আলম সাহেবরা ভারতের এই ইচ্ছা অনুসারেই তখন এ ব্যাপারে টু শব্দটি করেননি কিংবা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু সেই ইনু সাহেবরা এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিতে পাগল হয়ে উঠেছেন কেন? কারণ সেই একই। যে ভারতের ইচ্ছার কারণে সেদিন ইনু সাহেবরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাননি, আজ সেই ভারতের ইচ্ছা পূরণের জন্যেই ইনু সাহেবরা বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী খুঁজছেন। উদ্দেশ্য দেশের দেশপ্রেমিক শক্তিকে বিতর্কিত করা এবং তত্ত্বধায়ক সরকারকে অন্যকাজে ব্যাপৃত করে সামনের নির্বাচনকে অনিশ্চিত করা এবং দেশের সামাজিক সুস্থিরতাকে নষ্ট করে দেশকে আরও সংকটের মুখে ঠেলে দেয়া, যাতে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণিত করা সহজ হয়।

ইনু ও সিরাজুল আলম সাহেবরা সেদিন যেমন বিদেশী মিশন বাস্তবায়নে ব্যস্ত ছিলেন, আজও তেমনি বিদেশী মিশন নিয়েই তারা সামনে এগুতে চাচ্ছেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের কি হলো? কি হলো আওয়ামী লীগের বর্তমান প্রধান জিল্লুর রহমানের? তারা কেন স্বাধীনতা উত্তর আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান এবং তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সিদ্ধান্ত পদদলিত করে ইনুদের পিছনে চলতে চাচ্ছেন? তারা কি সেদিনকে ভুলে গেলেন? ভুলে গেলেন স্বাধীনতা উত্তর শেখ মুজিব সরকারের কলাবরেটরদের (চারটি বড় অপরাধ ছাড়া) ক্ষমা ঘোষণার যৌক্তিকতার কথা এবং চিহ্নিত-চারটি বড় অপরাধের দীর্ঘ দু'বছর কোন মামলা দায়ের না হওয়ার বাস্তবতার বিষয়?

কারও ভুলে যাওয়াতে কিন্তু ইতিহাস পাল্টায় না। স্বাধীনতা উত্তর শেখ মুজিবের সরকার কন্তু হঠাৎ করেই কলাবরেটরদের ক্ষমা ঘোষণা করেননি। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানী সৈন্যদেরই যখন অবস্থার কারণে বা অবস্থার প্রয়োজনে নিঃশর্তে ছেড়ে দিতে হলো, তখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যারা পাকিস্তানী সৈন্যের সহায়তা করেছেন বা তাদের সহযোগী হয়েছেন, তাদের শাস্তি দেয়ার যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি বলেই বাংলাদেশের তদানিন্তন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহামান কলাবরেটরদের সাধারণ ক্ষমা করেন। ঘটনা কিন্তু এটা নয়। কলাবরেটরদের ক্ষমা য়োষণা এ ধরনের কোন চিন্তা থেকে হয়নি। সাধারণ দাবি ও সাধারণ জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতেই এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হয়। ১৯৭২ সালের মার্চ থেকেই আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজলের মত দেশের শীর্ষ বুদ্ধিজীবীসহ রাজনৈতিক নেতবৃন্দের তরফ থেকে কলাবরেটরদের ছেড়ে দেবার আবেদন ও দাবি উত্থিত হতে থাকে। এককালিন আওয়ামী লীগ নেতা এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী একজন সর্বজনমান্য নেতা জনাব আতাউর রহমান খান এই সময় এক বিবৃতিতে

www.pathagar.com

বলেন ঃ

"জাতি পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধা না করে সরকার সারা দেশে দালাল ও কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত আছেন। মনে হচ্ছে, এটাই যেন সরকারের সব চাইতে প্রধান কর্তব্য। যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হননি, তাদের উপর গুরুতর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোন উপকার হবে না। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগে যারা বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের অনেকে সরকারের উচ্চপদে আসিন হয়েছেন, অথচ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন থাক সত্ত্বেও যারা পাক বাহিনীকে সমর্থন দান করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে কিংবা শরণার্থী হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। এই আইন জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং এই আইনে মাধ্যমে বিচার একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার ও সকল বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ করছি।"

এই ধরনের বিভিন্ন বিবৃতি ও দাবির প্রেক্ষিতে এবং দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে ১৯৭৩ সালের ৩০ শে নভেম্বর শেখ মুজিবের সরকার সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে নিম্নোক্ত 'প্রেস নোট' প্রচার করেন ঃ

"সরকার ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশে (১৯৭২) সালের রাষ্ট্রপতির ৮ নং আদেশ মোতাবেক অপরাধের দায়ে দণ্ডিত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নটি পুনরায় বিবেচনার পর ঘোষণা করিতেছেন ঃ

(১) এই আদেশের ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) উক্ত আদেশ মোতাবেক যে কোন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড ১৮৮৮ সালের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০১ ধারা মোতাবেক মওকুফ করা হইল এবং উক্ত আদেশ ব্যতিত অপর কোন আইন বলে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের সহিত জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতারী পরওয়ানা না থাকিলে সেইসব ব্যক্তিকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে;

(খ) উক্ত আদেশ বলে যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে সে সব প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং এই আদেশ ব্যতিত অপর কোন আইনে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধের হুলিয়া না থাকিলে তাদেরকে সরকারি হেফাজত হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে;

(গ) এই আদেশ বলে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধের দায়ে যে সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে অথবা তদন্ত চলিতেছে সেই সব মামলা ও তদন্ত কার্য বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সব গ্রেফতারী পরওয়ানা অথবা আদালতের হাজির হওয়ার নির্দেশ এবং এই আদেশ বলে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ থাকিলে ইহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অপর কোন আইনে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য না হইলে তাহাদেরকে সরকারি হেফাজত হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে; তবে কোন ব্যক্তি অনুপস্থিতিতে দণ্ডিত হইয়া থাকিলে অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা থাকিলে তাদের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

উপযুক্ত আদালতে হাজির হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকিবে।

(২) এই আদেশ বলে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা (হত্যা), ৩০৪ ধারা (হত্যার চেষ্টা কিন্তু হত্যার শামিল নয়), ৩৭৬ ধারা (ধর্ষণ), ৪৩৫ ধারা (অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন). ৪৩৬ ধারা (ঘরবাড়ী ধংসের অভিপ্রায়ে অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন) এবং ৪৩৮ ধারা (জাহাজে অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন) মোতাবেক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ১ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ক্ষমা প্রদর্শন প্রযোজ্য হইবে না।

মুজিব সরকারের এই ক্ষমা ঘোষণা সর্বমহল থেকে অভিনন্দিত হয়। মুজিব সরকারের প্রবল বিরোধী এবং বাম আন্দোলনের গুরু বলে পরিচিত, ভাসানী ন্যাপের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি তার এবং দলের সম্পাদক মণ্ডলির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক এক বিবৃতিতে বলেন, 'ন্যাপ বহু আগে থেকেই নিরপরাধ ব্যক্তিদের মুক্তি দাবি করে আসছে'। বিবৃতিতে, বাংলাদেশ দালাল আইন সংক্রান্ত আইনের ৮ নং ও ৫০ নং ধারা বাতিল করার দাবি জানান। তিনি ১৫ই ডিসেম্বর আরেক বিবৃতিতে বলেন 'ক্ষমা চাই, সমানাধিকার চাই। রাষ্ট্রপতি আদেশের ৫০ ও ৮ ধারা বাতিল চাই'। বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান তার বিবৃতিতে বলেন 'আরো আগেই দেশের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। এর ফলে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেবেন।' দেশের প্রবীণ রাজনীতিক ও চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারকে অভিনন্দিত করে বলেনঃ 'জনগণের ভাগ্যকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্যে সরকার সঠিক পন্থাই বেছে নিয়েছেন। গণতন্ত্রের এ উদ্যম বজায় থাকলে উজ্জল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে।' সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা এবং স্বনামধন্য কলামিস্ট ও লেখক আবুল মুনসুর আহমেদ (স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের পিতা) বলেন 'আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় সরকার যখন একবার অনুকম্পার দরজা খুলিয়াছেন, ষোল হাজারের মতো বন্দীকে মাফ করিয়া দিয়েছেন, তখন বাকী সবার ক্ষেত্রেও তেমনি উদারতা প্রদর্শন করুন। অন্যথায় দুই বছর পরে আজ যেমন চারশ লোককে প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হলো, বার বছর পর (৩৭ হাজার দালালদের বিচারে ১২ বছর লাগবে) মানে গ্রেফতারের সময় হতে ১৪ বছর পর আরো অনেক লোককে তেমনি মুক্তি দিতে হইতে পারে।' (ইত্তেফাক, ২ নবেম্বর, ১৯৭৩)। তদানীন্তন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ শেখ মুজিব সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করে বিবৃতি দেয়।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মত ১৯৭৬ সালে কলাবরেটর আইনের বাতিলও ছিল অবস্থার একটা স্বাভাবিক পরিণতি। ১৯৭৩ সালের ৩০শে নবেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছিল ১ লাখ লোককে এবং ৩৭৪৭১ জন দালালকে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের বিচারের জন্য ৭৩টি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। এই ৭৩টি ট্রাইবুনালে ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলার বিচার কাজ সম্পন্ন হয়। এদের মধ্যে দন্ডিত হয় মাত্র ৭৫২ জন, তাও প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছোট খাটো অপরাধের জন্য। অবশিষ্ট ২০৬ জন খালাশ পেয়ে যান। এই পটভূমিতে ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়। সাধারণ ক্ষমার অধিনে ১৯৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ছাড়া পেয়ে যায় ৩০ হাজার বন্দী। কিন্তু হত্যা, ধর্ষন, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ এই চার অপরাধের

www.pathagar.com

বিচার, গ্রেফতার ও শাস্তি বিধানের আইনী বিধান বহাল রাখা হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার ১৯৭৬ সালের দালাল আইন বাতিল হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ দুই বছর এক মাস সময়ে উক্ত চার অপরাধের অভিযোগে একটিও মামলা দায়ের হয়নি। এই অবস্থার পটভূমিতেই ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে দালাল আইন বাতিল হয়ে যায়।

এখানে একটা বড় প্রশ্ন হলো ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে কোন মামলা দায়ের হলোনা কেন? এর একটি জবাব হলো ঐ চারটি অপরাধের ক্ষেত্রে দায়েরযোগ্য কারও কোন অভিযোগ ছিলনা। এই জবাবটি বাস্তব নয়। কারণ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংঘাতে দায়েরযোগ্য ঐ ধরনের কোন অপরাধ ছিলনা তা হতে পারেনা। অন্য আরেকটি জবাব এই হতে পারে যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিও ছিল, অপরাধও ছিল কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংক্ষুব্ধরা অভিযোগ বা মামলা দায়েরে আগ্রহী হয়নি। এটাই বাস্তবতা বলে ধরে নেয়া যায়। কেন আগ্রহী হয়নি? কেন সংক্ষুব্ধ মানুষ অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য মামলা দায়েরে এগিয়ে যায়নি? খুব বড় একটা প্রশ্ন এটা; এক কথায় এর কোন জবাব মিলবেনা। এই প্রশ্নের জবাব প্রকৃতপক্ষে সন্ধান করতে হবে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো এবং বাংলাদেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় চিন্তার মধ্যে। এই ক্ষেত্রে এই সময়ের সুন্দর একটা সমাজ বিশ্লেষণ দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক ডঃ তারেক মুহাম্মাদ তওফীকুর রহমান তার "বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজঃ ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)" শীর্ষক গ্রন্থে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর অবস্থার উত্তাপ ঠান্ডা হয়ে আসার সাথে সাথে দালাল আইনে ধৃত এবং বিচারের সম্মুখীন ব্যক্তিদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়টি সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার সৃষ্টি করে চলছিল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে- এই সামাজিক চিত্রটি এক কথায় সামনে আনার পর তিনি লিখেছেনঃ

"আপাতঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও শত্রুতার নেপথ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ হলো 'কমপ্যাক্ট সোসাইটি'। আবহমান কাল থেকে শাশ্বত গ্রাম্য সালিশ বিচার ব্যবস্থার প্রচলনে গ্রামীন সমাজে যে ভারসাম্য বর্তমান ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তা নতুন আঙ্গিকে ও নেতৃত্বে স্থিতিশীল হয়ে আসতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের উত্তেজনা কেটে যেতে থাকে এবং মুক্তিযোদ্ধাগণও সমাজের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে থাকেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তীতে উত্তেজনা প্রশমনে রক্তের বন্ধন, আত্মীয় সূত্রতা এবং সমাজ গোষ্ঠীর বন্ধনে অপরাধকারী দালালদের আশ্রয় দেবার ব্যাপক প্রবণতা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। 'ক্ষমাই মহতের লক্ষণ' এই মহানুভবতার চিরন্তনী আবহে লালিত বাংলার মানস গঠন শাস্তি বিধানের পরিবর্তে সামাজিক সালিশ ও সমঝোতার পথেই অগ্রসব হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় একই পরিবারের পিতা শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছে, অপরদিকে পুত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। পিতা ও পুত্রের এই বিপরীত অবস্থান দীর্ঘ দিন আক্রোশ মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। মুক্তিযোদ্ধা পুত্র দালাল পিতাকে বাঁচানোর জন্য তদ্বির শুরু করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অনেক দালাল এমনও ছিল যে, তারা গোপনে মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে এবং প্রয়োজনমত নিরাপত্তা দিয়েছে। দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত ঐ ব্যক্তিটি পরবর্তী কালে ঐসব মুক্তিযোদ্ধারের আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং আশ্রয় পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থায় বা ভিন্নভাবে যাই হোকনা কেন, মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রায় দুই হাতে ধৃত ও অভিযুক্ত

www.pathagar.com

দালালদের ছেড়ে দেবার সুপারিশ করতে থাকে। যা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দপ্তরকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে তোলে। গ্রাম্য সালিশ, দেন দরবার, তদ্বির হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যকার কারণে পরবর্তীকালে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত বাদীপক্ষগণ মামলা চালাতে উদ্যোগ গ্রহণ হতে পিছিয়ে আসে, এমনকি মামলার ন্যূনতম স্বাক্ষ্য জোগাড় করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।"

এটাই ঘটনা। সামাজিক রাজনৈতিকসহ নানা ধরনের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বাধঁন স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর পক্ষ-বিপক্ষকে সমন্বয় ও সমঝোতার দিকে নিয়ে যায়। সৈয়দ আবুল মকসুদ 'প্রথম আলো'-তে তার 'সহজিয়া কড়চায়' এই কথাই লিখেছেন এইভাবে, কোন যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দালালদের বিচার না হওয়ার মূল কারণ, অনেক মন্ত্রী, সাংসদ নেতা ও বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানীদের সহযোগী ছিল। তাদের বাচাঁতে গিয়ে সকলকেই বাঁচিয়ে দেয়া হয়। (প্রথম আলো, ১৩ নবেম্বর, ২০০৭)। শুধু বাঁচিয়ে দেওয়া নয়, দীর্ঘ দুই বছর এক মাস সময় পর্যন্ত দালাল আইন বহাল তবিয়তে থাকলেও খুন, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এই চার অপরাধের অভিযোগে মামলা দায়ের না হবার এটাও একটা কারণ। আরেকটা কারণ হলো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান ছিল কিংবা পাকিস্তান বাহিনীর সহায়ক হিসাবে রাজাকার এর মত যে সব বাহিনী কাজ করেছে, যুদ্ধপরাধী বা অপরাধী' শুধু মাত্র তাদের মধ্যেই ছিলনা অন্যান্য দল ও গ্রুপের মধ্যেও যুদ্ধপরাধী বা অপরাধী ছিল। এ বিষয়ে সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেনঃ 'এখনকার পত্রিকা পড়লে মনে হয় শুধু মুসলিমলীগ, জামায়াত বা নেজামে ইসলামীর লোকেরাই পাকিস্তানীদের দালাল ছিল। বস্তুত সব শ্রেনী ও গোষ্ঠীর মধ্যেই পাকিস্তানীদের সহযোগী ছিল। আব্দুল হক তার কম্যুনিষ্ট পার্টির নামের সাথে বাংলাদেশ হবার পরও 'পূর্ব পাকিস্তান' রেখে দেন। অত্যন্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ পাকিস্তানীদের সহযোগীতা করেছেন। (প্রথম আলো, ১৩ নবেম্বর, ২০০৭)। এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপের পরস্পরের মধ্যেও যুদ্ধাপরাধ বা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন বিবরণীতে এক দৃষ্টান্ত আছে। সম্প্রতি এটিএন এর সাথে এক সাক্ষাতকারে মেজর জেনারেল (অবঃ) মঈনুল হোসেন চৌধুরী এক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন যুদ্ধাপরাধী বলতে আমরা জানি একটা ইসলামী দলকে বোঝানো হচ্ছে যারা ডানপন্থী। আমি বলবো যুদ্ধাপরাধীতো সরকারী কর্মচারীও ছিল। আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি। কারণ আমি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। একজন বাঙ্গালী ক্যাপ্টেন মারা যায় সরাইলে। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে হত্যা করে। কিন্তু ঐ ক্যাপ্টেনকে পরে শহীদ উল্লেখ করা হয়। সুতরাং যখন যুদ্ধাপরাধী বলবেন তখন সবাইকে বলতে হবে।'

সবাইকে যুদ্ধাপরাধী বলতে হচ্ছে বলেই স্বাধীনতা উত্তরকালে অবশেষে বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরে এগিয়ে যায়নি কেউ। দু'বছর সময়কালে দালাল আইনে মামলা দায়ের না হবার এটাও একটা বড় কারণ। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতাসহ উপরোক্ত সব কারণ সম্মিলিতভাবে ১৯৭৬ সালে দালাল আইন বাতিল হবার পটভূমি রচনা করে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে বিষয়টা এইভাবে প্রতিভাত হবার সময়ের দাবী পুরণের অংশ হিসেবেই তিনি দালাল আইন বাতিল করেন। আওয়ামী লীগসহ যারা এ জন্য জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করেন, তারা নিছকই রাজনীতি

www.pathagar.com

করেন, বাংলাদেশের সমাজ ও জনগণের কথা, এমনটি তাদের মন কি বলে সেটাও বিবেচনা করেননা।

আসলে ইনু সিরাজুল আলম খানের বামরা এবং আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দল বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধচারণের তাদের যে রাজনীতি, সে রাজনীতির খোরাক হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে যুদ্ধপরাধের বিচার ও স্বাধীনতা বিরোধী শ্লোগানকে। তাদের এই মানসিকতার বিকাশ ঘটেছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বরে তাদের দাবীর মধ্য দিয়ে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, অন্য কথায় ইসলামী রাজনীতি তারা করতে চায়। এটা চায় বলেই তারা জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী দলগুলোর তথা ইসলামের উৎখাত চায়। তারা যে প্রকৃত অর্থেই ইসলামের উৎখাত চায় তার নগ্ন প্রকাশ ঘটে শাহরিয়ার কবিরের একটা উক্তির মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি ইটিভির একটি অনুষ্ঠানে সংবিধানের মুলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের বিতাড়ন ঘটিয়ে 'আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস' কে সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ 'সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন করা হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার নৈতিকতা হারিয়ে ফেলবে। এই রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন নেই। এটাই যদি এই রাষ্ট্র হবে কেন আমরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করলাম? কেন আমরা পাকিস্তান ভাঙলাম? আমরা যদি ঐ হুকুমত কায়েম করতে চাই পাকিস্তানই আমাদের জন্য ভালো ছিল, বড় দেশ ছিল। আমরা একটা সেক্যুলার দেশ চেয়েছিলাম বলে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি।

অর্থাৎ শাহরিয়ার কবির এখানে বলেছেন যে বাংলাদেশে ইসলাম থাকলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রই তার দরকার নেই। এখানে বলে রাখা ভালো, সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, শাহরিয়া কবিরের এই কথা সর্বৈব মিথ্যা। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌম অধিকার কায়েমের জন্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষানাপত্রের এটাই সারকথা এবং মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছে এই লক্ষ্যেই। শতকরা ৯০ জন মুসলিমের দেশ বাংলাদেশে ইসলাম থাকবে, এটা শুধু নীতিগত নয়, গণতন্ত্রের কথাও। তবে শাহরিয়ার কবিররা ইসলাম চাইবে না এটাই স্বাভাবিক। কারণ তাদের বাম পন্থা ও তাদের পরভোজী রাজনীতির এটাই চরিত্র। এই চরিত্র দ্বারা তাড়িত হয়েই তারা জামায়াতে ইসলামীকে উৎখাত প্রচেষ্টার একটা অজুহাত হিসাবে জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত যুদ্ধপরাধ ও স্বাধীনতা বিরোধিতার শ্লোগান তুলছে।

শাহরিয়ার কবির-ইনু-সিরাজুল আলম খানরা এই শ্লোগান তুলতে পারেন। কারণ তারা স্বাধীনতা-উত্তর জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের আমলেও বিদেশী স্বার্থের শিখণ্ডীপনার পরিচয় দিয়েছেন। তখন বিদেশী ষড়যন্ত্রে যেমন তারা স্বাধীনতা উত্তর সরকারকে উৎখাত করে বিজাতীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠায় রত ছিল, আজও তেমনি তারা বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ ইসলামের উৎখাত করে দেশকে বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের অখন্ড ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের কি হলো? তারা তাদের নেতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি এবং স্বাধীনতার-উত্তর সরকারের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি কি ভুলে গেলেন, না পরিত্যাগ করলেন? শেখ মুজিবুর রহমান তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে

www.pathagar.com

তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে যুদ্ধাপরাধ চ্যাপ্টার ক্লোজ করেছেন এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে নিছক 'কোলাবরেটর' হওয়াকে শাস্তিযোগ্য করার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহিত শেখ মুজিবুর রহমানের এসব সিদ্ধান্তকে আওয়ামী লীগ কি আজ অন্যায়, অবাঞ্ছিত বলে মনে করছে ? কিন্তু আওয়ামী লীগ তো এই কথা বলছে না, তা হলে তাদের হৈ চৈ-এর অর্থ কি? কেন তারা অর্থহীন কোরাস গাইছেন, ইনু-মেননদের সাথে ? এটা যদি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার তাদের রাজনীতি হয়, তাহলে তাদের জানা দরকার জনগনের ইচ্ছার প্রতিধ্বিনি করে স্বাধীনতার স্থপতি এবং তাদের নেতা শেখ মুজিবই এই রাজনীতিকে অচল করে দিয়ে গেছেন। জনগণও এই সাথে একে সমাধিস্থ করেছে। এই কারনেই দালাল খান এ সবুর তিন আসন থেকে নির্বাচিত হন, শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, বিচারপতি নূরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের মনোনীত এমপি প্রার্থী হতে পেরেছিলেন, মওলানা নূরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের ধর্মমন্ত্রী হবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার বেহাই হয়েছেন। হাজার বলেও যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধী বলে জামায়াতে ইসলামীকে খাটো করা যাবে না। স্বাধীনতা উত্তরকালে তদন্ত করে তৈরি যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় জামায়াতে ইসলামীর কারও নাম ছিল না এবং দালাল আইনে যে ৭৫২ জনের শাস্তি কনফার্ম করা হয়েছিল, তাদের মধ্যেও ছিল না জামায়াতে ইসলামীর কোন লোক। আমি মনে করি জামায়াতে ইসলামীকে অন্যায় হিংসার লক্ষ্য বানানো এবং অহেতুক ও বিদ্বেষাত্মক অপপ্রচারের শিকারে পরিণত করা মজলুম জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আল্লাহর সাহায্যকে অতীতে যেমন নিশ্চিত করেছে, ভবিষ্যতেও তেমনি করবে। হিংসার আগুন আসলে হিংসুককেই পুড়িয়ে মারে। এটা শুধু নীতি কথা নয়, জাগতিক মনস্তত্ত্বের কথাও এটাই। ঢাকার প্রচলিত একটি প্রবাদ হলো 'যাকে বলি মর মর, সে পায় দৈবের বর'।

সূত্র ঃ

১। ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পিটার কাসটারস-এর জবানবন্দী, তারিখ ১৯৭৬ সালের মার্চ (মাসুদুল হক এর 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ')পৃষ্টা ১১৪-১১৭।

২। 'উপমহাদেশের মানচিত্রের আসন্ন পরিবর্তন' সাপ্তাহিক বিচিন্তা, ৩০ জানুয়ারী।

৩। 'সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ', মোঃ আব্দুল হালিম, পৃষ্টা-১৪১।

৪। মাসুদুল হক, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ', পৃষ্টা- ১১৬।

৫। ক্ষমা ঘোষণা সম্পর্কিত তথ্য ও উদ্ধৃতি অধ্যাপক আবু সাইয়িদ লিখিত 'সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম' শীর্ষক বই থেকে গৃহিত (মুক্তি প্রকাশনী, ঢাকা)।

৬। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজ ঃ ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১), ড. তারেক মুহাম্মদ তাওফীকুর রহমান।

৭। ঐ, ২৫৭, ২৫৮।

দৈনিক সংগ্রাম, ২১ নবেম্বর ২০০৭

www.pathagar.com

গরজটা একান্তই রাজনৈতিক
যুদ্ধাপরাধ ও স্বাধীনতাবিরোধী প্রশ্নে শূন্যে গদা ঘুরানো হচ্ছে

।। দূরবীন ।।

আইন, বাস্তবতা কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে যুদ্ধাপরাধ, স্বাধীনতাবিরোধী প্রসঙ্গ নিয়ে শূন্যে গদা ঘুরোনো হচ্ছে। স্বাধীনতার স্থপতি, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ সরকারের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান নিজে যেখানে যুদ্ধাপরাধী প্রশ্নের ইতি ঘটিয়েছেন, এমনকি দালাল আইন যেকোনে আপনাতেই অকার্যকর, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে শেষ হয়ে গেছে, সেখানে বিনা কারণে, বিনা প্রমাণে স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পর জামায়াতে ইসলামীকে এসবের সাথে জড়িত করে নানা রকম কথা বলা হচ্ছে। অভিজ্ঞ মহলের অভিমত, এই অপচেষ্টার মধ্যে সুস্পষ্ট দুরভিসন্ধি রয়েছে। তারা মনে করছেন, চোররাই চোর চোর বলে চিৎকার করছে, কেউ আবার না ভেবে না বুঝেই তাদের সাথে কোরাশ তুলছেন। জামায়াতের আপোষহীন দেশপ্রেমই অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি মহলের কাছে। স্বাধীনতার শত্রু ঐ মহলটিই 'শত্রুর মিত্র শত্রু' এই তত্ত্ব অনুসারে জামায়াতকে বৈরী ভাবছেন। মনে করা হচ্ছে, আইন ও বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে যে ইস্যুটির ইতি ঘটেছে, তাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই জিঁইয়ে রাখা হচ্ছে।

'স্বাধীনতাবিরোধী' 'যুদ্ধাপরাধী'- এই শব্দগুলো আইনের দৃষ্টিতে খুবই গুরুতর শাস্তিযোগ্য বিষয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হবার ৩৬ বছর পর যদি কারও বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত হয়, তাদের বিচার হয় যুদ্ধের পরই। অবশ্য কোন চিহ্নিত হওয়া তালিকাভুক্ত যুদ্ধাপরাধী পালিয়ে থাকলে, যখনই সে ধরা পড়ে তখনই তার বিচার হয়। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নুরেমবার্গ ট্রায়ালে সব যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও শাস্তি হতে পারেনি। বড় বড় অপরাধী অনেকেই পালিয়ে ছিল। যারা পালিয়ে ছিল, তাদের বিচার যখনই তারা ধৈরা পড়েছে তখনই হয়েছে। কিন্তু কারা যুদ্ধাপরাধী তার অনুসন্ধান ও তালিকা প্রণয়ন কিন্তু নূরেম ট্রায়াল এবং তার আগেই সম্পন্ন হয়েছে। শুধু পলাতকদের বিচার সম্পন্নের কাজ পরে হয়েছে, তারা ধরা পড়ার পর।

আমাদের দেশও একটা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে। এ যুদ্ধেও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর তাই যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্যে যুদ্ধাপরাধের তদন্তও হয়েছে। সে তদন্তের আওতায় ছিল পাকিস্তান সেনা বাহিনী ও তাদের সহায়ক বাহিনীগুলো। তদন্তের মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত হওয়া এবং তাদের বিচারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে। সরকারি ঘোষণায় বলা হয়:

"Press Release of the Government of Bangladesh on War Crimes Trial (17 April 1973)

Investigations into the crimes committed by the Pakistani occupation forces and their auxiliaries are almost complete. Upon the evidence, it has been decided to try 195 persons of serious crimes, which include genocide, war crimes, crimes against

www.pathagar.com

humanity, breaches of Article 3 of the Geneva Conventions, murder, rape and arson. Trials shall be held in Dacca before a Special Tribunal, consisting of judges having status of judges of the Supreme Court.

The trials will be held in accordance with universally recognized judicial norms eminent international jurists will be invited to observe the trials. The accused will be afforded facilities to arrange for their defence and to engage counsel of their choice, including foreign counsel. A comprehensive law providing for the constitution of the Tribunal, the procedure to be adopted and other necessary materials is expected to be passed this month. The accused are expected to be produced before the Tribunal by the end of May 1973."[১১]

বাংলাদেশ সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৯৭৩ সালের মে মাসের শেষ দিকে যুদ্ধাপরাধীদেরকে বিচারিক ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করার কথা ছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়নি। পরবর্তী এক বছরের বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান ও ভারত, বাংলাদেশ ও ভারত এবং বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে অব্যাহত আলোচনার ফল হিসেবে উপমহাদেশে শান্তি ও সমঝোতার স্বার্থে এবং পাকিস্তান সরকারের ভুল স্বীকার ও বাংলাদেশের জনগণের কাছে 'forgive and forget'-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালের ৯ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের মধ্যে চূড়ান্ত আলোচনা শেষে এক এ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ্যাগ্রিমেন্টিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আজিজ আহমদ এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ সিং। ত্রিদেশীয় এই এ্যাগ্রিমেন্টের সংশ্লিষ্ট ধারায় বলা হয়:

"13. The question of 195 Pakistani prisoners of war was discussed by the three Ministers, in the context of the earnest desire of the Governments for reconciliation, peace and in friendship in the sub-continent. The Foreign Minister of Bangladesh states that the excesses and manifold crimes committed by these prisoners of war constituted, according to the relevant provisions of the U.N. General Assembly Resolutions and International Law, war crimes, crimes against humanity and genocide and that there was universal consensus that persons charged with such crimes as the 195 Pakistani prisoners of war should be held to account and subjected to the due process of law. The Minister of State for Defence and Foreign Affairs of the Government of Pakistan said that his Government condemned and deeply regretted any crimes that may have been committed.

14. In this connection the three Ministers noted that the matter should be viewed

www.pathagar.com

in the context of the determination of the three countries to continue resolutely to work for reconciliation. The Ministers further noted that following recognition, the Prime Minister of Pakistan had declared that he would visit Bangladesh in response to the invitation of the Prime Minister of Bangladesh and appealed to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past in order to promote reconciliation. Similarly, the Primes Minister of Bangladesh had declared with regard to the atrocities and destruction committed in Bangladesh in 1971that he wanted the people to forget the past and to make a fresh start, starting that the people of Bangladesh knew how to forgive.

15. In the light of the foregoing and in particular, having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistan to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past, the Foreign Minister of Bangladesh stated that the Government of Bangladesh had decided not to proceed with the trials as an act of clemency. It was agreed that the 195 prisoners of war may be repatriated to Pakistan along with the other prisoners of war now in the process of repatriation under the Delhi Agreement."

এইভাবে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ছেড়ে দেবার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-উদ্ভূত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুর ইতি ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধকালে যারা স্বাধীনতায় যোগ দেয়নি কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক বা অন্য অপরাধমূলকভাবে বিরোধিতা করেছে, তারা তাদের অপরাধের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতাবিরোধী বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে দ্বিমতপোষণকারী। স্বাধীনতাউত্তর সরকারকে এদের সমস্যাও মোকাবিলা করতে হয়। এ জন্যে তদানীন্তন সরকার 'যুদ্ধাপরাধী' বিষয়ের বাইরে এদের অপরাধমূলক কাজের শাস্তি বিধানের জন্যে ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি 'দালাল আইন' জারি করা হয়। এই আইনের অধীনে প্রায় ১ লাখ লোককে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে থেকে অভিযোগ আনা হয় ৩৭ হজার ৪শ ৭১ জনের বিরুদ্ধে। এই অভিযুক্তদের মধ্যে ৩৪ হাজার ৬শ' ২৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে কোনো মামলা দায়েরই সম্ভব হয়নি। ২ হাজার ৮শ ৪৮ জন বিচারে সোপর্দ হয়। বিচারে ৭শ ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং অবশিষ্ট ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। ১৯৭৩ সালের ৩০ নবেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিরোধ, বিতর্ক, বিভেদ মুছে ফেলার জন্যেই এ ক্ষমা ঘোষণার ফলে দালাল আইনের অধীনে ছোট-খাট অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত, অভিযুক্ত সকলেই জেল থেকে বেরিয়ে আসে। সাধারণ ক্ষমায় কিন্তু হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অপরাধকে ক্ষমা করা হয়নি। অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এইসব অপরাধ যারা করেছে, তাদের অভিযুক্ত করা ও শাস্তি দেয়ার দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে জিয়াউর রহমান দালাল আইন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন। কিন্তু তার আগে এই দীর্ঘ সময়ে ঐ চার অপরাধের জন্যে উক্ত আইনের

www.pathagar.com

অধীনে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। সম্ভবতঃ এই কারণেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া এই আইনকে জিয়াউর রহমান বাতিল করেন।

যুদ্ধাপরাধ আইন দালাল আইনের এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মত বড় অপরাধসহ ছোট-খাট অপরাধের বিচারের ব্যাবস্থা ও উদ্যোগ স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকার গ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্ত অভিযোগের বিচারও হয়েছে। বিচারের জন্যে আইন ও মামলা দায়েরের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালের ৩০শে নবেম্বর থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি ২ বছর এক মাসে উক্ত দালাল আইনের অধীনে হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ অপরাধের আর কোনো মামলা হয়নি। দায়ের করার মত অভিযোগ বা মামলা না থাকা বা মামলার উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ না করাই এর কারণ। ফল হিসেবেই দালাল আইন বাতিল হয়ে যায়।

সুতরাং নিশ্চিত হওয়া গেল যে মুক্তিযুদ্ধের সময় বড় ছোট যে অপরাধমূলক ঘটনা দালাল করাবরেটররা ঘটিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তার বিচারের ব্যবস্থা করেছে, অপরাধীদের বিচার করেছে। তারপর নিছক কলাবরেশন ও ছোট-খাটো অপরাধকারীদের জন্যে ক্ষমা ঘোষণা করেছে এবং বড় বড় অপরাধের বিচারের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। কিন্তু দীর্ঘ ২ বছরেও বড় বড় অপরাধের কোন অভিযোগ না আসায় সে আইনও বাতিল হয়েছে। এখন দীর্ঘ ৩১ বছর পর কেউ যদি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অপরাধের বিচারের শ্লোগান তোলে এবং বলে যে, জনগণের অর্থাৎ অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে অভিযোগের প্রয়োজন নেই, সরকারকেই অভিযোগ আনতে হবে, তাহলে তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীনই বলতে হবে।

প্রশ্ন হলো এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা কেন? উত্তর হলো, এটা একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজনীতি। যারা জামায়াতে ইসলামীকে টার্গেট করে যুদ্ধাপরাধী তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন, তারা খুব ভালো করেই জানেন, জামায়াতের উল্লেখযোগ্য লোকদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধোত্তর আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ সময়ে যেমন কোন অভিযোগ ওঠেনি, তার ৩১ বছর পরও আজ তেমনি কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা সম্ভব হবে না। তাহলে তারা হৈ চৈ করছেন কেন? উত্তর সেই একটাই-রাজনীতি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই সময়ে সময়ে এমন হৈ চৈ জামায়াতের বিরুদ্ধে বাধানো হয়, আবার রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তার ইতি ঘটানো হয়। পেছনে তাকালে এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যাবে।

তবে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নেয়। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। জামায়াতের অঘোষিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমকে বিদেশী নাগরিক অভিহিত করে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কারের জন্যে মহা হৈ চৈ তোলা হয়েছিল। এর পিছনে ছিল রাজনীতি। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই হৈ চৈ তোলার মাধ্যমে একটি মহলকে খুশী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন এরশাদ সরকারের হৈ চৈ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে শুরু হয়েছিল এটা জানি, কিন্তু এরশাদ সরকার হঠাৎ চুপ মেরে গিয়েছিলেন কেন সেটা আমার জানা নেই।

১৯৯১ সালে জামায়াত নিজে ক্ষমতার শরিক না হয়েও বিএনপিকে সরকার গঠনে সাহায্য করার পর বিক্ষুব্ধ আওয়ামীবলয় এরশাদ সরকারের পত্যিক্ত হৈ চৈ টাকে মহা আকার দিয়ে আবার জিন্দা করে তোলে। ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে গঠিত হয় ৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। আওয়ামী লীগ বলয়ের সকল সামাজিক-

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক সংগঠন এতে শামিল হয়। '৭১-এর ঘাতক দালালদের নির্মূল করাকে এরা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীই হয় একমাত্র টার্গেট। জামায়াতে ইসলামীর অঘোষিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমসহ জামায়াত নেতাদের বিচারের জন্য তারা গণআদালত বসায় মহাআড়ম্বরে। ড. কামাল হোসেনের মত অনেক বিজ্ঞ আইনজীবী অবিজ্ঞের উন্মাদ-উৎসাহ নিয়ে এ গণআদালতে শামিল হন। তারা জামায়াতে ইসলামীর জন্যে একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। কিন্তু অশ্বডিম্ব প্রসব করে এই আন্দোলনটি ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ে। কারণটি ছিল বিএনপি সরকারের পতনের আন্দোলন এবং '৯৬-এর নির্বাচন। যে আওয়ামী লীগ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি করে জামায়াতে ইসলামীকে নির্মূলের আন্দোলন করলো, সেই আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে জামায়াতকে নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন করতে একটুও লজ্জাবোধ করলো না। এভাবে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির মাধ্যমে জামায়াতকে নির্মূল করার যে আন্দোলন আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শুরু করেছিল, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তা শেষ হয়ে যায়। এই রাজনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে জামায়াতের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলায় ভীতি এবং আওয়ামী রাজনীতি নিয়ে তাদের সমর্থকদের মধ্যেও প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশংকাও শামিল ছিল। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিমান্ডে থাকাকালে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ঘাদানিকদের আন্দোলন নিয়ে কেন তারা বেশি দূর আগায়নি, কেন তারা পিছু টান দিয়েছিল আন্দোলন থেকে এমন প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, জামায়াতে ইসলামী বেশি প্রচার পাচ্ছিল এই কারণেই তারা আন্দোলন থেকে সরে যায়। এটাও একটা কারণ অবশ্যই। কিন্তু আসল কারণ ছিল, জামায়াতে ইসলামীকে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল বিএনপিকে এক ঘরে করে ৯৬- এর নির্বাচনে নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করা।

২০০১ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ঐক্য যখন আসন্ন হয়েছিল, তখন জামায়াতকে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী, একাত্তরের দালাল অভিহিত করে জামায়াতের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। ২০০১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ঘাদানি কমিটি সৈয়দ হসান ইমামের সভাপতিত্বে শহীদ মিনার চত্বরে এক সম্মেলন করে। সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী, সিপিবির সভাতি মঞ্জুরুল আহসান খান, এডাব সভাপতি খুশী কবির, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেতা ড. আখতারুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি আব্দুল মতিন চৌধুরী, জাসদের রওশন জাহান সাথী, ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন। সম্মেলনে 'ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ও ট্রাইব্যুনালে ইসলামী রাজনীতিকদের বিচার দাবী' করে বক্তারা বলেন, 'দেরীতে হলেও সরকার মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে (জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মুফতি ফজলুল হক আমিনী ও শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক গ্রেফতার হয়েছিলেন)। মৌলবাদীদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই আঘাত করতে হবে। আঘাতের পর আঘাতে ওদের খতম করতে হবে। সভাপতির ভাষণে হাসান ইমাম বলেন, '৯২ সালে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, এখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে শুরু হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল শেষ হয়েছে। ফাইনাল খেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির বিজয় হবে' (ইনকিলার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০১)। এই বিজয়ের লক্ষ্যে জামায়াত ও ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে তারা প্রবল আন্দোলন শুরু করে। তাদের মিটিং, সম্মেলন ও দাবি-দাওয়ার মিছিল চলতে থাকে। তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি করে। ২ এপ্রিল ২০০১ ঘাদানি

www.pathagar.com

কমিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে 'জামায়াত-শিবির ও স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী চক্রের বিরুদ্ধে' আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি করে। এই সাক্ষাৎকালেই জুনের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ৫ দেশীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হয়। ঠিক হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। এ সাক্ষাৎকারে হাজির ছিলেন শাহরিয়ার কবীর, অধ্যাপক কবীর চৌধুরীসহ অন্যান্যরা। ২৭ আগস্ট ২০০১ তারিখে ঘাদানি কমিটির সংগঠন, আওয়ামীবলয়ের আরেকটি হাতিয়ার ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করে, মৌলবাদ ও রাজাকার আলবদরদের মনোনয়ন না দেয়ার ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২ কোটি ভোটার দস্তখত করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও নাগরিক প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন, তৃণমূল জনসংগঠন, উন্নয়ন কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রগতিশীল মোর্চা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতিসহ ১ হাজার ১ শ' টি এনজিও এবং ৭৫০টি সংগঠনের ১০ লাখ কর্মী দেশব্যাপী এই স্বাক্ষর অভিযানে অংশ নেয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে হাজির ছিলেন ড. কাজী ফারুক আহমদ, ড. আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, কল্যাণ সাহা।' (সংবাদ ২৮ আগস্ট, ২০০৭) নির্বাচনের আগে এই আন্দোলনকে তারা আরও তুঙ্গে নিয়ে যায়। তারা সম্ভবত ফাইনাল শো-ডাইন করে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে সংসদ ভবনের সামনে এক মানবন্ধন আয়োজনের মাধ্যমে। এ মানববন্ধনের আয়োজন করে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি। এতে অংশগ্রহণ করে মহিলা পরিষদ, প্রজন্ম-৭১, চারুশিল্পী সংসদ জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ঐকব্যদ্ধ নাগরিক আন্দোলন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ, প্রশিকা, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম শিল্পী পরিষদসহ হেনা দাস, সি.আর. দত্ত, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, চিত্রা ভট্টাচার্য, সেলিনা হোসেন, শ্যামলী নাসরিন, আবুল বার্ক আলভী, কাজী মুকুল, শাহরিয়ার কবীর প্রমুখ। মানববন্ধনে 'রাজাকার মুক্ত সংসদ গঠনের আহবান জানিয়ে জামায়াতের ৩০ জন এবং ইসলামী ঐক্যজোটের ৭ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে তাদের ভোট না দেয়ার আবেদন জানিয়ে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, রাজাকাররা যেন পার্লামেন্টে আসতে না পারে, সে জন্য জনগণকে সচেতন হতে হবে। আগামী ১লা অক্টোবরের ভোটে তাদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে।' (দৈনিক আল আমিন, ২১ অক্টোবর ২০০১)

চূড়ান্ত পর্যায়ে মানববন্ধনের এই আহবানের মধ্যে দিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে ঘাতক নির্মূল কমিটি তথা আওয়ামী বলয়ের স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধ শ্লোগানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য একবারে নগ্ন হয়ে যায়। আওয়ামী বলয় চেয়েছিল জামায়াতকে স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী অভিহিত করে জামায়াতের সাথে জোট গঠনকারী বিএনপি'র ভোট নষ্ট করতে। নির্বাচনে জোট সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও জামায়াত ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৭টি আসনে জয়লাভের পর দেশ থেকে রাজনৈতিক ময়দান থেকে জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী বলে গাল দেয়ার তুখোড় আন্দোলন শেষ হয়ে গেল। তার বদলে নির্বাচনের পরপরই ঐ ঘাদানিকদেরকেই সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্লোগান নিয়ে মাঠে নামতে দেখা গেল। জামায়াতের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন রাজনৈতিক প্রয়োজনে শুরু হয়েছিল, রাজনৈতিক কারণেই সে আন্দোলন নির্বাচনের পর শেষ হয়ে গেল। পরবর্তীকালে ২০০৭ নির্বাচনকে সামনে রেখে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে আবার মাথা তুলতে দেখা গেছে। দল হিসেবে জামায়াত এবং ব্যক্তি পর্যায়ে জামায়াত নেতাদের চরিত্র হননের জন্যে

www.pathagar.com

অব্যাহতভাবে মন্তব্য কলাম ও নিউজ আইটেম লেখা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল জামায়াত সম্পর্কে, জামায়াত-নেতাদের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে জামায়াতকে দুর্বল করা এবং এ ধরনের জামায়াতের সাথে ঐক্যজোট না করতে বিএনপিকে বাধ্য করা, যাতে '৯৬ সালের মত বিএনপিকে একঘরে করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় যেতে পারে। কিন্তু মানুষ ঘাদানিকদের মিথ্যাচার বিশ্বাস করেনি, জামায়াত দুর্বল হয়নি এবং চারদলীয় জোটও ভেঙ্গে যায়নি।

আজ দেশে জরুরি অবস্থার এক পর্যায়ে জামায়াত নেতৃত্বকে যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধী সাজাবার সেই ঘাদানিক আন্দোলন আবার জোরেশোরে শুরু হয়েছে। এ আন্দোলনে শাহরিয়ার কবীরদের মত পুরাতন মুখের সাথে নতুন কিছু মুখ যোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে আন্দোলনে নতুন গতি লাভের সুযোগ হয়। আন্দোলনের দাবিও আগের মত একই রয়ে গেছে। তবে জরুরি অবস্থা থাকার কারণেই সম্ভবত: এবারে মাঠে নয়, মিডিয়াকে কেন্দ্র করে চলছে এই আন্দোলন। দু'একটি চ্যানেল এবং কয়েকটি পত্রিকা ইসলামী দলগুলো বিশেষ করে জামায়াতের বিরুদ্ধ এ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দারুণভাবে সক্রিয়। এদের মতি গতি দেখলে মনে হয় এরা এই আন্দোলনকে মিশন হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন এই লোকরা তো বিনালাভে তুলাও বয় না। কিন্তু তুলা নয়, লোহা যখন বইছে এরা, তখন বলতে হবে কোন রাজনৈতিক মতলবের তারা ক্রীড়নক। সেই রাজনৈতিক মতলব বা উদ্দেশ্যটা কি এবং সে নটরাজনীতিক বা নট রাজনৈতিক পক্ষই বা কে?

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা এবং জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী বা স্বাধীনতা বিরোধী সাজাবার বিগত আন্দোলনের হোতা ছিল আওয়ামী লীগ সরকার। '৯২ উত্তর ঘাদানিক আন্দোলনও আওয়ামী লীগ বলয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। আশির দশকে, জামায়াতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী ও অধ্যাপক গোলাম আযমকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার যে আন্দোলন হয়, তার পেছনে ছিল এরশাদ সরকার। জামায়াত ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, তার পেছনে অবশ্যই বড় কারও হাত রয়েছে। সে হাত এবার সরকারের অবশ্যই নয়। কারণ, এখন কোন রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় নেই। ক্ষমতায় এখন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার। তারা এ ধরনের আন্দোলনের পেছনে থাকতে পারেন না। আইনী দিক থেকেও এ ধরনের আন্দোলনের পেছনে তাদের থাকার কথা নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ বিষয়টা পরিষ্কারও করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন উপদেষ্টা জনাব মইনুল হোসেন অতীতের রাজনৈতিক সরকার যে দায় গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করেননি, সে দায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নয় বলেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদও এ দায় সরকারের নয় বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে, কেউ সংক্ষুব্ধ বোধ করলে তিনি আদালতে যেতে পারেন। আদালতের দরজা খোলা।

আন্দোলনের সাথে ব্যক্তি সংশ্লিষ্টতার দিকের বিচারে ৯২ উত্তর এবং ২০০১ নির্বাচনপূর্ব ঘাদানিক আন্দোলনের সাথে বর্তমান আন্দোলনের ষোল আনা মিল আছে। কিন্তু এই আন্দোলনের পেছনে আওয়ামী বলয়ের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি হতে পারে! এখন দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলছে ভাঙ্গাগড়া। দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি বিভেদ-বিতর্কের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগও অক্ষত নয়। শীর্ষ দুই নেতা সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকসহ অনেক নেতা তাদের জেলে। এ সময় অতীতের ব্যর্থ আন্দোলন নতুনভাবে শুরু করার পেছনে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

www.pathagar.com

এ প্রশ্নে ঐকাধিক বিকল্পের কথা বলা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি হলো, আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপি'র মধ্যেকার বিভেদ বিতর্কে খুবই আনন্দিত। জরুরি অবস্থায় আওয়ামী লীগের ক্ষতি হলেও দল অবিভক্ত রয়ে গেছে। সুতরাং আওয়ামী লীগ বিএনপি'র চেয়ে ভাল অবস্থানে। কিন্তু চারদলীয় জোটে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট অটুট আছে। এটা আওয়ামী লীগের জন্যে মাথা ব্যাথার কারণ। বিএনপি দুর্বল হলেও তার মাঠ ময়দান ঠিক আছে। এই অবস্থায় জোট যদি অটুট থাকে এবং জোটের দ্বিতীয় প্রধান অংশ জামায়াতে ইসলামী যদি অটুট থাকে, তাহলে আওয়ামী লীগের কোন ভবিষ্যত নেই। সুতরাং ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের নামে যদি জামায়াতসহ ইসলামভিত্তিক দলের রাজনীতিকে বাধাগ্রস্ত করা যায় এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের শ্লোগান তুলে ইসলামী নেতৃত্বকে মামলা মোকদ্দমায় যদি জড়ানো যায়, তাহলে চারদলীয় জোটকে দুর্বল কর অবিভক্ত আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ পরিষ্কার হতে পারে। তবে এর চেয়ে যে আশংকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে, সেটা হলো বিদেশী ষড়যন্ত্রের বিষয়। প্রতিবেশী দেশ ভারত অন্ততঃ গত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতায় পরিষ্কার বুঝেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে ট্রানজিট, গ্যাস, চিটাগাং বন্দর এবং অবাধ মার্কেটের সুযোগ ইত্যাদি তাদের কোন দাবিই পূরণ হবে না। এজন্যে সে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক সরকার চাচ্ছে না। বরং তারা মনে করছে যেভাবে ২২শে'র নির্বাচন বানচাল করা গেছে, সেভাবে যদি ২০০৮-এর নির্বাচন বানচাল করে দেশে সামরিক শাসন আনা যায়, তাহলে রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলের অসন্তুষ্টি এবং জনগণের বিপরীতে দাঁড় করানো যাবে। এতে ভারত এক ঢিলে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থের পথের তিনটি মূল বাধাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে। দেশকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূণ্য করা অথবা রাজনৈতিকদের অকার্যকর করা, ইসলামী দল ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে এদেশী মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তির বড় উৎস ইসলামকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া এবং দেশ রক্ষার মূল শক্তি সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা- এই তিন বাধা দূর করতে পারলে ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়নকে ভারত এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ মনে করছে। এরই সুযোগ গ্রহণ করতে চাচ্ছে ভারত। এক্ষেত্রে আওয়ামী বলয়কে নগদ লাভের লোভ দেখিয়ে ভারত তাদের ব্যবহার করছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মতে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সুতরাং যে কোন বিচারেই এবারের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ক আন্দোলন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কারণেই।

যারা যে উদ্দেশ্যই থাক, এ আন্দোলন একেবারে শূণ্যে গদা ঘোরানোর মত। যুদ্ধাপরাধের বিচার সংক্রান্ত আইনের কোন অস্তিত্ব এখন নেই। তেমনি দালাল আইনও এখন নেই। সতরাং সরকারের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভবে সংক্ষুব্ধ হবার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। তবে যে কোন অপরাধের বিচার করার আইন বাংলাদেশের আছে। এই আইনে যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বিচার চাইতে পারেন, তবে সেটা যুদ্ধাপরাধ বা দালাল আইনের বিচার হবে না।

অবশ্য কেউ চাইলে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে যুদ্ধাপরাধ ও দালাল অপরাধকে জিইয়ে রাখতে পারেন, যতদিন মন চায় ততদিন। এটাই এখন চলছে।

শেষ করার আগে আরেকটা কথা বলি, আজ নতুন করে যুদ্ধাপরাধী তৈরী বা দালাল বানানোর সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিচার প্রক্রিয়ার পর এই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বন্ধ হয়নি স্বাধীনতা বিরোধী তৈরী হওয়ার পথ। স্বাধীনতা বিরোধীরা অতীতে ছিল, এখনও তাদের ষড়যন্ত্র আছে। তবে মুক্তিযুদ্ধকালে যারা

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কারণে এবং এক আশঙ্কার ফলে এর বিরোধিতা করেছিল, তারা কিন্তু এখন স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় আন্তরিক সৈনিক। কারণ, এ দেশ ছাড়া তাদের যাবার আর কোন জায়গা নেই এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী গত ৩৬ বছরে তাদের স্বাধীনতা বিরোধিতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি, এমনকি সেরকম কোন অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে ওঠেনি, কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধকালে এ দেশকে ভারতের কাছে বিকিয়ে দেবার সাত দফা গোপন চুক্তি করতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য করেছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধের পরপরই দিল্লী গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রস্তাব করেছিল বাংলাদেশকে ভারতের একটা প্রদেশ হিসাবে ভারতের সাথে যুক্ত করার, সেই স্বাধীনতা বিরোধীরা আছে এবং আশঙ্কা হয় যে তাদের বংশ বৃদ্ধিই ঘটছে।

শেষোক্ত ঘটনা দু'টো স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ইতিহাসের পেছনের পাতা একটু উল্টাতে হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশকে সাহায্য করার বিনিময়ে ভারত এ নিশ্চয়তা চেয়েছিল যে, বাংলাদেশ তার অনুগত হয়ে থাকবে। এই নিশ্চয়তার দলিল হিসেবেই ভারত অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের মত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বাধ্য করেছিল অধীনতামূলক এক গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। এই চুক্তির একটা বিবরণ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান, স্বধীনতার পর দিল্লীতে বাংলাদেশের প্রথম হাইকমিশনার এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ এমপি এবং আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় শাসনামল '৯৬ থেকে ২০০১ সময়ে জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী। তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেন,

"১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক চুক্তিতে, প্যাক্ট নয়, এগ্রিমেন্টে আসেন। এই চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট অনুসারে দু'পক্ষ কিছু প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতায় আসেন। প্রশাসনিক বিষয়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের যে প্রস্তাবে রাজি হন তাহলো, যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। .....সামরিক ক্ষেত্রে সমঝোতা হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে। .....বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না। অভ্যন্তরিণ আইন শৃংখলা রক্ষার জন্যে মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে। .....বানিজ্যিক ক্ষেত্রে যে চুক্তি হয়, সেটা খোলা বাজার ভিত্তিক। খোলা বাজার ভিত্তিতে চলবে দু'দেশের বানিজ্য। বৈদেশিক বিষয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যে চুক্তিতে আসেন সেটা হলো, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে।...মূলতঃ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারত। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুহূর্তেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ভারত সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এই পুরো ব্যবস্থাকেই অগ্রাহ্য করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর কারণে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশ পাকিস্তানী সৈন্যমুক্ত হয় মাত্র, কিন্তু স্বাধীন-সার্বভৌম হয় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে যেদিন শেখ মুজিব পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা আসেন।"[৩]

হুমায়ূন রশীদ সাহেব এখানে বলেছেন চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুহূর্তে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অন্য সূত্রে শোনা গেছে তিনি জ্ঞান হরিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি দেশপ্রেমিক এবং দেশের স্বাধীনতাকে তিনি ভালবাসতেন বলেই চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হওয়ার পর এর আঘাত তিনি সামলাতে পারেননি। যারা বাইরের যোগসাজশে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে এই চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিল, তারাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রু, তারা স্বাধীনতা বিরোধী। এরা তখনও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের আশপাশে ছিল বন্ধু সেজে, পরবর্তীকালেও ছিল এবং এখনও আছে তারা বাংলাদেশে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পরই বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুতার আরেকটি বড় ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের কয়েকজন নাগরিক স্বাধীনতার পর পরই দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়েছিলেন বাংলাদেশকে একটা প্রদেশ হিসেবে ভারতভুক্ত করে নেবার আবেদন নিয়ে। এ ঘটনারও একটা ছোট্ট বিবরণ দিয়েছেন দিল্লীতে বাংলাদেশের তদানীন্তন মিশন প্রধান হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী। উপরে উল্লেখিত সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেন:

"মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত ছিল। সেই সূত্রে প্রধানমন্ত্রীর (ইন্দিরা গান্ধীর) ব্যক্তিগত স্টাফদের সঙ্গে আমার হৃদিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রধানমন্ত্রীর এক ব্যক্তিগত স্টাফ আমাকে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ আমাকে জানান যে, আগের দিন অর্থাৎ ২৮শে ডিসেম্বর তিনজন সংখ্যালঘু নেতা, যাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন সূতার ছিলেন একজন (আওয়ামী লীগ এমপি), প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তাঁরা তাঁর কাছে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করে রাখার প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রীর ওই ব্যক্তিগত স্টাফ সেই সময় সেখানে ছিলেন। তিনিই ওই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন।

পরে আমি বাংলাদেশে সরকারকে বিষয়টি অবহিত করি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। তারা কিছু সংখ্যালঘু নেতা চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে সিকিম ধরনের ভারতীয় অংশ করতে।"[৪]

যারা সেদিন বাংলাদেশের স্বধীনতাকে বিক্রির জন্যে দিল্লী গিয়েছিলেন তাদের মত বাংলাদেশের শত্রুরাই বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিল। এই স্বাধীনতা বিরোধীতা এখনও আছে।

এদের স্বাধীনতা বিরোধিতার একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হিসাবে শাহরিয়ার কবীরের তৎপরতার উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি ঘটে ২২শে নবেম্বর ২০০১ সালে। তিনি সেদিন কলকাতা থেকে ঢাকা ফেরার পথে ঢাকা বিমান বন্দরে ষড়যন্ত্রমূলক ডকুমেন্টসহ ধরা পরেন। এ ডকুমেন্টগুলোর মধ্যে ছিল ৪টি ভিডিও ক্যাসেট, ১টি ডিএইচএস ভিডিও ক্যাসেট, ১০টি অডিও ক্যাসেট এবং ৩টি সিডি, যেগুলোতে রয়েছে নানা স্পর্শকাতর তথ্য। ২৬ নবেম্বর, ২০০১ সালের এক রিপোর্টে দৈনিক মানবজমিন এ সম্পর্কে লিখে, "তার (শাহরিয়ার কবীরের) ক্যাসেটে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের ব্যানারে বিভিন্ন মিছিলের চিত্র রয়েছে। সূত্র মতে, বৃহত্তম বরিশাল, যশোর, খুলনা ও ফরিদপুরের বেশ কিছু লোক পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী শিবির গড়ে তোলে। কলকাতাস্থ নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ। শাহরিয়ার নির্মিত ক্যাসেটে

www.pathagar.com

আপত্তিকর, চাঞ্চল্যকর ও দেশদ্রোহিতার তথ্য নিয়ে গোয়েন্দারা মাঠে নেমেছেন। ...নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের সভাপতি হলেন 'চিত্তরঞ্জন সুতার (ইনি স্বধীনতার পর দিল্লী গিয়েছিলেন বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করার আবেদন নিয়ে)। তিনি আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা প্রায় ১ কোটি টাকার বিনিময়ে ক্যাসেট তৈরি ও 'পূর্ণিমা' নামের (সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ক) একটি ছবি তৈরির ক্ষেত্রে শাহরিয়ার কবীরকে বেছে নেয়। শাহরিয়ার কবীরের ক্যাসেটে স্বাধীন বঙ্গভূমি সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন নতুন তথ্য মিলেছে। তাদের ভাষ্য, খুলনা, যশোর, বরিশাল ও ফরিদপুরকে নিয়ে একটা স্বধীন রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ ও নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের শ্লোগান 'সীমারেখা মানছি না, মানবোনা'। ক্যাসেটে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, সীমারেখা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যা দূর করতে বঙ্গভূমির কোন বিকল্প নেই।"

শাহরিয়ার কবীরের এই অপরাধ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২৩-ক এবং ১২৪-ক ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অপরাধ। কিন্তু তিনি ২১ জানুয়ারি ২০০২ সালে হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। তারপর আর তাকে বিচারের কাঠগড়ায় ফিরতে হয়নি। আওয়ামী বলয়ের গোটা শক্তি, তার সাথে বাইরের কিছু তৎপরতা সংঘবদ্ধভাবে তার বিচারের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বিচার কাজ সামনে এগুবে না, এটাই সত্য। এমন কারণেই বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করার আবেদন নিয়ে বাংলাদেশী যারা দিল্লী গিয়েছিল তাদেরও বিচার হয়নি।

স্বাধীনতা-উত্তর দীর্ঘ ৩৬ বছরে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এই ধরনের স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আসেনি, যা এসেছে শাহরিয়ার কবীর ও চিত্ত সুতারদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ট্রাজেডি হলো, স্বাধীনতার শত্রু এই শাহরিয়ার কবীর ও চিত্ত সুতাররাই জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতা বিরোধী বলেন। ব্যাপারটা চোরের চোর চোর বলে চিৎকার করার মত। বিনা কারণে জামায়াতের সাথে শাহরিয়ার কবীরদের এই বৈরিতা কেন? কারণ হলো, শত্রুর মিত্র শত্রুই হয়। সময় স্বাক্ষি, সকল বিচারের জামায়াত দেশপ্রেমিক শক্তি-বলয়ের একটা বড় স্তম্ভ। জামায়াত স্বাধীনতার অজেয় বর্ম ইসলামের আন্তরিক ধারক বলেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এই স্তম্ভের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। শাহরিয়ার কবীর এবং তাদের বাইরের দোসরদের কাছে এটাই জামায়াতের মূল অপরাধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি বর্ম হওয়াকেই জামায়াতের অপরাধ ধরছে শাহরিয়ার কবীররা। আর শাহরিয়ার কবীর চিত্ত সুতাররা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলেই তারা জামায়াতে ইসলামীরও বৈরী।

তথ্য সূত্র ঃ

১। 'Document of India-Bangladsh-Pakistan Relation, The Sub-continent, An Information Service of India Publication, Page 43-44
২। ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।
৩। সাক্ষাতকার, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ', মাসুদুল হক, পৃষ্ঠা ১২৫, ১২৬।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১২৩।

-দৈনিক সংগ্রাম, ৭ নভেম্বর ২০০৭

www.pathagar.com

লালা লাজপত ও দেশবন্ধু যা জানতেন জিল্লুর শাহরিয়ার কবির তা জানেন না

।। দূরবীন ।।

বৃটিশ ভারতে মুসলিম ও হিন্দু জাতির মিল-অমিল ও সহযোগী-অসহযোগী হওয়ার এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার স্বনামধন্য হিন্দু নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সর্বভারতীয় হিন্দু নেতা এবং গান্ধীজীর গুরু লালা লাজপত রায়কে এক চিঠি লিখে বলেছিলেন যে, আপনি উদ্যোগ নিলে হিন্দু-মুসলিম একতা সম্ভব হবে এবং সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে এক দেশ হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হতে পারে। লালা লাজপত রায় দেশবন্ধুর চিঠির জবাব দিতে ছয়মাস সময় নিয়েছিলেন। ছয়মাস পর দেশবন্ধুর চিঠির উত্তরে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"একটা বিষয় যা আমাকে অত্যন্ত উদ্বেগগ্রস্ত করেছে এবং যে সম্পর্কে আমি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করতে বলি তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম একতা। বিগত ছয় মাসের বেশির ভাগ সময় আমি নিজেকে মুসলিম জাতির ইতিহাস ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে নিয়োজিত করেছি এবং আমার ধারণা এই ঐক্য সম্ভবও নয়, বাস্তবসম্মতও নয়। অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতা স্বীকার করেও আমি মনে করি তাদের ধর্ম এ রকম কোন কিছুকে কার্যকরীভাবেই বাধা প্রদান করে।.... আপনার মনে আছে, হাকিম আজমল ও ডাঃ কিসুলর সাথে আমার যা আলোচনা হয়েছিল তা কলকাতায় আমি আপনার নিকট রির্পোট করি। হিন্দুস্থানে হাকিম আজমল খান অপেক্ষা চমৎকার লোক হতে পারে না। কিন্তু কোন মুসলিম নেতা কি কুরআনকে অতিক্রম করতে পারেন? আমি কেবলই আশা করি, আমি যা অনুধাবন করেছি তা মিথ্যা হোক।.... কিন্তু আমি যা অনুধাবন করেছি তা যদি সত্য হয়, তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, যদি আমরা বৃটিশের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে পারি, তবুও আমরা বৃটিশ শাসনপদ্ধতি অনুযায়ী শাসন (অর্থাৎ নিছক সংখ্যাগুরুর কর্তৃত্ব) প্রতিষ্ঠা করতে পারিনা। গণতান্ত্রিক পন্থায় হিন্দুস্থানে শাসনও চালাতে পারি না।....কিন্তু প্রতিকার কি? আমি ভারতের সাত কোটি মুসলমানকে ভয় করি না (কারণ সংখ্যায় হিন্দুরা ৩/৪ গুণ বেশি), কিন্তু হিন্দুস্থানের সাত কোটির সাথে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, আরব, মেসোপটেমিয়া ও তুরস্কের সশস্ত্র মোর্চা অপ্রতিরোধ্য।..... আমি সত্যিই এবং আন্তরিকভাবেই হিন্দু-মুসলিম একতায় বিশ্বাস করি (অবশ্য যতক্ষণ মুসলমানদের হিন্দু সংখ্যাগুরুত্ব দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায়)। আমি মুসলিম নেতাদেরকেও বিশ্বাস করতে রাজি আছি (অবশ্য যতক্ষণ তাদের বাধ্য বশংবদ করে রাখা যায়)। কিন্তু কুরআন-হাদীসের অনুশাসনের কি হবে? এই মুসলিম নেতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না। আমি আশা করি, আপনার বিদগ্ধশালী মানস ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মস্তিস্ক এই অসুবিধাজনক পরিস্থিতি হতে নিষ্ক্রমণের কোন একটা উপায় বের করবেন।"

লালা লাজপত রায়ের এই চিঠি খুবই ইন্টারেস্টিং। তিনি কুরআন-হাদীস এবং ইতিহাস পড়ে মুসলমানদের জেনেছেন। কুরআনের আলোকে তিনি মুসলমানদের জানতে ভুল করেননি। আর হিন্দুদের তো চেনেনই। এই জানা-চেনা থেকে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাও খুব ইন্টরেস্টিং। তিনি বলেছেন, ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সাথে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ঐক্য হতে পারে যদি মুসলমানরা হিন্দুদের বশংবদ হতে রাজি হয়। তার মতে মুসলমানদের পক্ষে হিন্দুদের বশংবদ হওয়া সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

কারণ, কারও বশংবদ হতে হলে তাদেরকে কুরআন ত্যাগ করতে হবে। আর কুরআন ত্যাগ করতে পারবে না মুসলমানরা। সুতরাং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভব নয়, একথা চিত্তরঞ্জন দাসকে তিনি জানিয়েছিলেন। লালা লাজপত রায় মুসলমানদের সংখ্যাকে ভয় করেননি, ভয় করেছেন কুরআন-হাদীসের অনুশাসনকে। কারণ, তিনি জেনেছেন কুরআন-হদীসের অনুশাসন মুসলমানকে অন্য কোন জাতির বশংবদ হতে দেবে না। অন্য কথায় কুরআন-হাদীসের অনুশাসনই মুসলমানদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এ বাস্তবতা তিনি জেনেছিলেন এবং মান্যও করেছিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপারে হলো, যে বাস্তবতা লালা লাজপত রায়ের মত একজন হিন্দু জানতেন ও মানতেন, মুসলমান হওয়ার পরও সেই যোগ্যতা শাহরিয়ার কবিরদের নেই, জিল্লুর রহমানদের নেই, যদিও বুদ্ধিজীবী ও প্রবীণ রাজনীতিক হওয়ার দাবি তাদের আছে।

এই অযোগ্যতা শাহরিয়ার কবির, জিল্লুর রহমান সাহেবদের অজ্ঞতার ফল। এই অজ্ঞতা লালা লাজপাত রায়েরও ছিল। কিন্তু তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের চিঠি পাওয়ার পর সে চিঠির জবাব দেবার আগে মুসলমানদের জীবন সম্পর্কে জানার জন্যে মুসলমানদের আদর্শ, ইতিহাস, ঐতিহ্যের উপর ছয়মাস ধরে লেখাপড়া করেছেন, কুরআন-হাদীস থেকে মুসলমানদের প্রত্যক্ষভাবে জেনেছেন। তার পরেই তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, একজন মুসলমান যদি মুসলমান হয়, তাহলে তার পক্ষে কোরআন-হাদীসের অনুশাসনের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়, সত্যিকার কোন মুসলমান তা যায়ও না। এই বোধ শাহরিয়ার কবির, জিল্লুর রহমান সাহেবদের নেই। ইসলাম সম্পর্কে তাদের দুঃখজনক অজ্ঞতাই এর কারণ।

তাঁরা ইসলামী রাজনীতি, তাদের ভাষায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে বিরোধিতা তাঁরা করছেন, তার কারণ ইসলাম সম্পর্কে তাদের লজ্জাজনক অজ্ঞতা। তারা অনেক লেখাপড়া করেছেন, অনেক ডিগ্রি নিয়েছেন, কিন্তু নিজেদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন ভালো করে পড়েননি, কুরআনে আল্লাহ কি বলেছেন, হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কি বলেছেন, তা বুঝে পড়ে জেনে নেয়ার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। যদি তারা পড়তেন, তাহলে জানতেন কুরআন-হাদীসে শুধু নামাজ-রোজার কথা নেই, তার সাথে আছে অর্থনীতি পরিচালনার কথা, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা, বিচার অনুষ্ঠান ও শাস্তি বিধানের কথা এবং আছে আইন প্রণয়ন ও আইন রক্ষার কথাও। আর এসব কাজের যোগফলই তো হলো রাজনীতি। রাজনীতিই নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি এবং আইন ও বিচারের মত সব বিষয়। সুতরাং কোরআন-হাদীস তাদের পড়া থাকলে তারা জানতে পারতেন, কুরআন থেকে, হাদীস থেকে রাজনীতি বাদ দেয়া যায় না। যায় না বলেই ইসলাম থেকে রাজনীতি বাদ দেয়ার কোন সুযোগ নেই। তাই মুসলমানদের রাজনীতি ধর্মভিত্তিক, মানে ইসলামভিত্তিকই হতে হবে। এটা শুধু কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব কথা নয়, এই কুরআনী রাজনীতির দৃষ্টান্ত ইসলামের গোটা ইতিহাস। স্বয়ং আল্লার রাসূল (সাঃ)-এর জীবন এবং তাঁর উত্তরসূরী খিলাফতে রাশেদার শাসন এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। শাহরিয়ার কবিররা, জিল্লুর রহমান সাহেবরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জীবন চরিত অবশ্যই পড়ার কথা। তাহলে তারা ভালো করেই জানেন শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু আল্লাহর রাসূল ছিলেন না, তিনি মদিনার প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকও ছিলেন। চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মোকাবিলায় তিনি সেনাপতিত্বও করেছেন। সে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন এবং বিচার ফায়সালাও তিনি করেছেন। সে রাষ্ট্রের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক একটা অর্থনীতিও পরিচালিত হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ শত্রুরও মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং

www.pathagar.com

অমুসলিম নাগরিকদেরও তিনি শান্তি-স্বস্তির মধ্যে রেখেছেন। এসব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিধি-বিধানও তার ছিল। এক কথায়, একই সাথে তিনি নবুওত ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তার উত্তরসূরী চার খলিফাও পালন করেছেন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ইসলামী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হলেও 'খিলাফত' পরিচয়ের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনেও ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও বিচারিক আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে বহাল ছিল। আল্লাহর রসূলের (সাঃ) শাসন, খিলাফতে রশেদার এই শাসন ইতিহাস শাহরিয়ার কবিররা এবং জিল্লুর রহমান সাহেবরা জানার পর ইসলামী বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির তারা বিরোধিতা করেন কি করে? ধরে নিতে হবে কি যে, তাঁরা আল্লাহর রাসূলের জীবনচরিত এবং ইসলামের ইতিহাস পড়েননি? তাদের মিথ্যাবাদী, কিংবা সত্য গোপনকারী ভাবতে চাই না। তার চেয়ে তারা এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ, এটা ধরে নেয়াই সমীচীন। আসলে এটাই সত্য। তারা অনেক পড়েছেন, অনেক জেনেছেন, কিন্তু নিজের কুরআন, হাদীস, নিজের রাসূল (সাঃ), নিজের ইতিহাস ঐতিহ্যকেই তারা জানার সুযোগ পাননি। আমাদের বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞ রাজনীতিকদের জন্যে এটা অপমানকর হলেও সময়ের একটা স্বাভাবিক ঘটনা এটা। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন যাদের ক্ষতি করেছে সবচেয়ে বেশি, তারা হলেন আমদের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক। আল্লামা ইকবাল এদের লক্ষ্য করে বলেছেন, পোশাক পরিচ্ছদে তুমি নাছারা, মনোবৃত্তিতে তুমি হিন্দু, তুমি এমনই মুসলমান যে শয়তানও দেখলে লজ্জা পায়। ঠিক এটারই জীবন্ত প্রতিকৃতি আমাদের শাহরিয়ার কবিররা। তবে তাদের দোষ নেই, অজ্ঞতাই তাদেরকের এই পর্যায়ে নামিয়েছে।

এই দুর্ভাগ্য শুধু আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের নয়, দুনিয়াজোড়া বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের বড় অংশ আজ এই দুর্ভাগ্যের শিকার। পাশ্চাত্য রেনেসাঁর উদ্ভব ঘটে বিজ্ঞান-বৈরী চার্চের বিরুদ্ধে প্রবল বৈরিতা নিয়ে। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা চার্চের শত্রু হতে গিয়ে সকল ধর্মকেই বৈরিতার চোখে দেখে, বিজ্ঞানমনস্ক ধর্ম ইসলামকেও । ইসলাম সম্পর্কে তাদের এই বৈরিতা একেবারেই অযৌক্তিক, অনুচিত। ব্যাপারটা ইসলামকে 'নিজের ধনে নিজেকে না চোর সাজাবার মত। ইউরোপের যে বিজ্ঞান রেনেসাঁ, তা ইসলামেরই সৃষ্টি। ইসলাম মুসলিম স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানের যে মশাল প্রজ্বলিত করে, আধুনিক সভ্যতার যে যাত্রা স্পেনে সাড়ম্বরে শুরু হয়, সেই বিজ্ঞান শিক্ষাই ইউরোপকে জাগরিত করে অন্ধকার থেকে ইউরোপকে সভ্যতার নতুন জগতে নিয়ে আসে। ইউরোপের একজন সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন, ইসলাম যদি বিজ্ঞানের আলো না জ্বালতো, ইসলাম যদি স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দরজা ইউরোপীয়দের জন্যে উন্মুক্ত না করতো, তাহলে ইউরোপ আরও কয়েকশত বছর অন্ধকারেই পড়ে থাকতো। কিন্তু সেই পশ্চিমের বস্তুবাদী সভ্যতার বুদ্ধিজীবীরা তাদের উস্তাদ ইসলামেরই আজ বেরী সেজেছে। এর একটি কারণ জ্ঞাণগত। তারা ইসলামী জীবনবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। দ্বিতীয় কারণটা রাজনৈতিক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শুরু করা ক্রুসেডে তাদেরই যে পরাজয় ঘটে, তার প্রতিহিংসা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামের প্রতি তাদের রাজনৈতিক বৈরিতা। অজ্ঞতা ও এই বৈরিতার কারণে এখন তারা ইসলামকে আদর্শিক, আইনি বা মানবিক দিক থেকে বিচার করে না, তারা ইসলামকে দেখে একটা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে। আর ইসলামের ধর্মীয় দিককে বিবেচনা করে খৃস্টান চার্চের আরেকটা রূপ হিসেবে। দুই বিবেচনা মিলিয়ে তারা ইসলামের একটি ভীতিকর রাজনৈতিক রূপ দাঁড় করিয়েছে। শাহরিয়ার কবিরদের মত আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও, যাদের দেখলে শয়তানও লজ্জা পায়,

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের এই মানসিকতা পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। এর পেছনে অজ্ঞতাই সবচেয়ে বড় কারণ।
ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবার মূলে মানুষের অজ্ঞতাই তাদের বড় শত্রু। এই অজ্ঞতার কারণে রাজনৈতিক দিক থেকেই ইসলামকে বিচার করছে আজকের পাশ্চাত্য এবং তাদের শিষ্য প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবীরা। 'Asian Survey' তে কিছুকাল আগে ইসলাম সম্পর্কে একটা সমীক্ষা বেরিয়েছিল। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন পত্রিকায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা সুনির্দিষ্ট ইসলামী ইস্যুতে স্বতঃস্ফূর্ত যে প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে, তাকে সুনির্দিষ্ট চারটি ক্যাটেগরীতে ভাগ করে সমীক্ষায় উপস্থাপিত করা হয়। চারটি ক্যাটেগরী হলো, থিয়োলজিক্যাল, একাডেমিক, হিউম্যানিস্ট ও পলিটিক্যাল। সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রকাশিত ১২০ টি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মাত্র ৬টি প্রতিক্রিয়া আসে থিয়োলজিক্যাল (ধর্মতত্ত্ব) ক্যাটেগরীতে, একাডেমিক ক্যাটেগরীতে ১০। হিউম্যানিস্ট (মানবিক) ক্যাটেগরীতে ১১ এবং রাজনৈতিক ক্যাটেগরীতে আসে ৯৩টি প্রতিক্রিয়া। দেখা যাচ্ছে মোট প্রতিক্রিয়ার ৭৮ ভাগই এসেছে রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে। এটাই মাঠের বাস্তবতা। ইসলামকে তার আদর্শিক, একাডেমিক, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনাই করা হচ্ছে না, দেখা হচ্ছে তাকে রজনৈতিক বিবেচনা থেকে। আর এই বিবেচনাটা হলো, ইসলাম খৃস্ট বা হিন্দু ধর্মের মতই একটা ধর্ম, যার রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, আধুনিক অর্থনীতি ও আইন ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই বলার নেই।

ইসলাম সম্পর্কে এটাই চলমান অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা, এ কথা পরিষ্কার, সত্যের একেবারেই বিপরীত। ইসলাম খৃষ্টান, হিন্দু ইত্যাদি আদর্শিকভাবে প্রায় মৃতকোন ধর্মের মত কোন ধর্ম নয়। মার্কিন বুদ্ধিজীবী এবং ইসলাম সম্পর্কে স্বনামধন্য একজন বিশেষজ্ঞ জন এল এসপোজিটো ইসলামের পুনরুজ্জীবনবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে ইসলামের Ideological World View সম্পর্কে লিখেছেন, "*..(1) Islam is a total way of life Therefore religion is integral to politics, state and society, (2) Islam, as found in the guidance of the koran, in the practice of the Prophet, and in the example of the early Islamic community/state provides the true alternative ideology for Muslim life.." (The Muslim World Today, occasional paper No 3 by American Institute for Islamic affairs, Page-3)* ইসলাম আজকের আধুনিক জীবন ব্যবস্থার (উদারনৈতিক পুঁজিবাদ, মুক্ত অর্থনীতি, মানবতা) মতই যে আধুনিক, সে বিষয় সম্পর্কেও পশ্চিমীদেরই অনেকে খুব ভালো করে জানেন। যেমন Godfrey Gansen লিখছেন, "*Today Islam and the modern western world confront and challenge each other. No other religion Posseses such a challenge to the West. Not Christianity, which is the part of the western world and which has been eaten up from within by the acids of the modernity. Not Hinduism and Budism, because their radiation to the West and has been and is on high, ethereal plane. And not Judaism, which is small and tribal a faith. No guru, no swami, no lama, no rabbi, has have any impact on the west comparable to that exerted by the Caliph, the*

www.pathagar.com

Mahadi and Ayatullah". ('Muslems and the Modern world', The Economist, Jan. 1981)"
আরেকজন পশ্চিমী ভদ্রলোক *Robin Wright Senior Associate, carnegic Endowment for International Peace* বলেছেন, *".....But because of its inherent mixture of religion and politics, Islam could well become one of the world's strongest ideological forces in the late twentieth Century". ('The islamic Resurgence: A new Phase', Current History, Feb, 1988)*
উপরে পাশ্চাত্যের তিন বুদ্ধিজীবীই ইসলাম ও রাজনীতিকে আলাদা করেনি, করতে পারেননি। এই সাথে স্বীকার করেছেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রের সব বিষয়েই ইসলাম আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমান প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাদের শাহরিয়ার কবিরদের মত তারা ইসলামে রাজনীতি নেই বলেননি এবং ইসলামকে ঠুঁটো জগন্নাথও মনে করেননি।

জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা পশ্চিমের কারও সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না। স্বয়ং আল কুরআন, হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার এবং ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য এ কথার চিরন্তন সাক্ষ্য যে, ইসলাম মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সবকিছুর পথ প্রদর্শক ও দিক-নির্দেশক।

সমস্যা একটাই সেটা হলো, ইসলামের ব্যাপারে শাহরিয়ার কবিরদের মূর্খতা। কিন্তু এ বাধাও দূর হচ্ছে। এক সময় আলেমরাও বিশ্বাস করত না বা জানত না যে, ইসলামে রাজনীতি এক অপরিহার্য বিষয়। আজ এখন শুধু আলেম নয়, সাধারণ শিক্ষিতরাও ব্যাপকভাবে এ ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ইসলামে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, এটা ছিল এক সময় হাস্যকর বিষয়। সে হাস্যকর বিষয় এখন জলজ্যান্ত বাস্তবতা। ইসলামী অর্থনীতির ওপর ডজন ডজন বই লেখা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক দেশের শীর্ষ ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। দেশের সব ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের উইনডো খুলেছে। গোটা দুনিয়ায় ইসলামী অর্থনীতি এখন একটা বাস্তবতা। অন্যদিকে ইসলামের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা অপ্রতিরোধ্য এক শক্তি। মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামে ইসলামের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এই শক্তিমত্তার একটা বড় প্রমাণ বৃটিশ ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিজয় এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির লাভ। বাংলাদেশের গৌরবপূর্ণ স্বাধীনতা তারই সৌভাগ্যবান উত্তরাধিকার।

ইসলামী পুনরুজ্জীবনের এই অপ্রতিরোধ্য ঢেউ শাহরিয়ার কবিরদের সব বিরোধিতাকে ডুবিয়ে ছাড়বে। সে স্রোতে গোসল করে শাহরিয়ার কবিররাও হবেন নতুন মানুষ। হতে পারেন নতুন লালা লাজপত রায়। একজন হিন্দু নেতা লাজপত রায়কে কুরআন, হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের পাঠ যদি ইসলামের ব্যাপারে বিজ্ঞ করে তুলতে পারে, তাহেল শাহরিয়ার কবিরদের অজ্ঞতা দূর না হবার কোনই কারণ নেই।

-দৈনিক সংগ্রাম, ১২ ডিসেম্বর ২০০৭

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র আর আমাদের চলতি তন্ত্র

।। মিনার রশীদ ।।

তৃতীয় বিশ্বের জনগণ নির্ভেজাল গণতন্ত্রের স্বাদটি পেয়ে যাক বর্তমান বিশ্ব মুরব্বিদের তা কাম্য নয়। নিজেদের এ কামনাটি হৃদয়ে পোষণ করে তারা নিরিবিলি বসে থাকেন না। সে জন্য প্রয়োজন পড়লে দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হাতটিকেও কাজে লাগান। নিজেদের এ অপকর্মটি সরাসরি স্বীকার করার চেয়ে বরং স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে সবার পেটে গণতন্ত্র নামক এ সুস্বাদু খাবারটি হজম হয় না। যাদের পেটটি নিয়ে এ অভিযোগটি করা হয় দুর্ভাগ্যক্রমে তারাও এর বিপরীত কথটি প্রমাণ করতে সক্ষম হন না। গণতন্ত্র নামক এ সুস্বাদু খাবারটিতে কেউ বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে রেখেছে কি না তা তলিয়ে দেখা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। নিজের পেটটির গোলমালই এতো স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, এ মিশ্রণকারীর খোজ নেয়া তখন আর সম্ভব হয় না। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি প্রভৃতি যখন মহীরূহ আকার ধারণ করেছে এবং এটাকে সম্বল করে অন্য একটা অগণতান্ত্রিক শক্তি উকি ঝুকি মারছে তখন তা সম্মিলিত শক্তিতে মোকাবেলার চিন্তা না করে আমাদের রাজনীতির সামনে অন্যান্য নন-ইসু আজ বড় ইসু হয়ে দেখা দিয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে মুরব্বিদের এ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এসব দেশের জনগণ বুঝতে পারে না কখন কি শুরু হয়ে যায়। আসলে এসব অপরিপক্ব গণতন্ত্রের ওপর একটা ব্রেকিং মেকানিজম লাগিয়ে রাখা হয়। যাতে দরকার পড়লে যে কোনো সময় ব্রেকটি চেপে ধরা যায়। আর এ চেপে ধরার কাজটি যে শুধু মূল মুরব্বিই করবেন তা নয়, দরকার পড়লে স্থানীয় মুরব্বিও তার নিজস্ব তাগিদেই তা প্রয়োগ করতে পারবেন। এ দেশের গণতন্ত্র কখন কোন দিকে চলে যায় তার মতির যেন ঠিক-ঠিকানা নেই। সততাতন্ত্র, সুশীলতন্ত্র বা জরুরিতন্ত্রের কাছে যতোটুকু আদব-কায়দা, আদর-আপ্যায়ন আশা করা যাবে প্রকৃত গণতন্ত্রের কাছে তা পাওয়া যাবে না। এ চাওয়াটির জন্যই আমাদের মতো দেশগুলোতে কখনই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

এ ব্যাপারে মূল কাজটি অবশ্য আমাদের কলোনিয়াল মাস্টার কলোনিটি ছেড়ে যাওয়ার সময়ই সেরে গিয়েছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন তার স্ত্রীর প্রেমিককে তখন এ বলে সান্ত্বনা দেন, 'ইনডিয়া বিভক্তি এবং কানের দুপাশে দুটি টিউমার নিয়ে মহাশয় কিছু ভাববেন না। দেখবেন পচিশ বছরও এভাবে ওরা এক সঙ্গে টিকে থাকতে পারবে না। কানটি এগিয়ে দেন, চুপি চুপি বলছি। (অবশিষ্ট কথাটুকু কানে কানে বলেন) তাদের ঐক্যের বীজ নয়, এর মাধ্যমে বিভেদ ও তিক্ততার চারা গাছটিই আসলে রোপণ করে গেলাম। তাতে মাঝে মধ্যে সামান্য পানি ছিটালেই এ গাছটি আপনাকে আজীবন ফল দিয়ে যাবে। এটিই আপনার জন্য আমার শেষ উপহার।'

সেই কানাকানির রেশই আসলে আমরা এখনো টানছি এবং আরো কতোদিন টানতে হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। এখন এ চারা গাছটিতে বাইরের কারো পানি দেয়ার দরকার নেই। টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথটিকে কর্দমাক্ত করে নিজেরাই ঘৃণা ও বিভক্তির এ চারা গাছটিতে মহা উৎসাহে পানি দিয়ে যাচ্ছি। ৩৬ বছর আগে মীমাংসিত

www.pathagar.com

(আমরা স্বাধীন হয়েছি, ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণেই আমাদের আর পাকিস্তানের কাঠামোতে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই) একটি বিষয় নিয়ে কেন আবার মেতে উঠেছি তার জবাব একটাই– ঘৃণা ও বিভক্তির এ চারা গাছটিতে এখন কিছু অতিরিক্ত পানি সেচনের দরকার হয়ে পড়েছে।

একদিকে স্বাধীনতার মূল স্থপতিকে জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে অন্যদিকে অতি বাধ্য এ ছেলেরা পিতার এ স্নেহের কোল থেকে অন্যদের ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। নিজেদের এ প্রচেষ্টায় তাকে সবার মোরাল অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত নয়– একটা শ্রেণীর ওয়ান আইড পিতা হিসেবেই অধিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। কারণ শুধু বাধ্য ছেলেদেরই নয়, একজন প্রকৃত পিতাকে তার অবাধ্য ছেলেদেরও কাধে তুলে নিতে হয়। এ কথাটি যদি পিতার এ অতি বাধ্য ছেলেরা বুঝতে চেষ্টা করতেন তবে আমাদের গণতন্ত্র ও এ দেশ আজ এ সঙ্কটে পড়তো না। জাতির পিতার স্বীকৃতির এ আবেদনটি তাই সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারেনি বরং তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতির পিতার বেতটি করায়ত্ত করে এসব ছেলেরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করতে চায়।

জাতির প্রকৃত অভিভাবক হওয়ার মতো যে লক্ষণীয় নর্মটি তিনি পূরণ করেছিলেন তাকেই এরা বারবার প্রশ্নের মুখোমুখি করে ফেলছে। জাতিকে বা তার নতুন এ সংসারটিকে সম্ভাব্য বিভক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য পিতা বা অভিভাবক হিসেবে তখন যে সাধারণ ক্ষমাটি ঘোষণা করে ছিলেন অতি বাধ্য সেই ছেলেরা তাই এখন উল্টে ফেলতে চাচ্ছেন। মাননীয় তথ্য উপদেষ্টা সে জন্যই হয়তোবা বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তুলে দেশে আগামী নির্বাচন ভন্ডুলের পায়তারা করা হচ্ছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। কাজেই আমরা বুঝেশুনে এ ধরনের কোনো চক্রান্তে পা দিয়ে দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারি না।
তিনি আরো বলেন, 'স্বাধীনতার পরে ৩৬ বছর ক্ষমতায় থেকে যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে যায়নি এখন তাদেরই বিচার করা উচিত কি না তা ভেবে দেখার সময় হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হলে নির্বাচিত সরকারই করবে। ৩৬ বছর তারা এ ব্যাপারে কথা না বলে থাকতে পেরেছে, সামনে আরো দু-এক বছর অপেক্ষা করলে কোনো বড় সমস্যা হবে না।'

আমাদের চরম দুর্ভাগ্য, এ দেশে এমন কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক অভিভাবকত্ব গড়ে উঠতে পারেনি যার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রজ্ঞা ও সাহসের সমন্বয়ে গড়া এ রূপ একটি অভিভাবক শ্রেণীর সৃষ্টি না হয়ে বুদ্ধি, কৌশল ও নিরপেক্ষতার মিশেলে বুদ্ধিজীবী নামক একটা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। তার সঙ্গে সংস্কৃতি জগৎ ও বিনোদন জগতের বড় একটা অংশ একাকার করে ভয়ঙ্কর এক ঘৃণার মেশিন সৃষ্টি করা হয়েছে। মাঝে মধ্যে মনে হয় জাতির সব বুদ্ধিই যেন এদিকে কাত হয়ে পড়েছে। এদের তোপের মুখে পড়ার ভয়ে এমন কাংক্ষিত একটা অভিভাবক শ্রেণীর সৃষ্টি হতে পারেনি।

প্রজ্ঞার অভাবে এবং বুদ্ধির আধিক্যে আমাদের নীতির রাজা–রাজনীতি আজকের এ

www.pathagar.com

পলিটিক্স হয়ে পড়েছে। প্রজ্ঞার কাছে ক্ষোভ, হতাশা, ক্রোধ বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু এসবই আবার বুদ্ধির কাছে প্রশ্রয় পেয়ে যায়। প্রজ্ঞার ওপর বুদ্ধির এ জয়ই আজকের পৃথিবীতে সর্বত্র সঙ্কট সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রজ্ঞা বলে গণতন্ত্রকে শর্তহীন করে রাখতে, কিন্তু বুদ্ধি বলে তার ওপর শর্ত আরোপ করতে। যে প্রজ্ঞার বলে সেদিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল আজকের বুদ্ধি বলছে, না তা ঠিক হয়নি।

তাছাড়া পুরো উপমহাদেশে শান্তির বিষয়টিও তখন সামনে এসে পড়েছিল। আমাদের এ ঘৃণার ফ্যাক্টরি থেকে যে ঘৃণার সৃষ্টি করা হচ্ছে তা সার্কের চেতনার সঙ্গে কতোটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই প্রশ্ন করাও রীতিমতো বিপজ্জনক। সৌভাগ্যক্রমে শান্তির সেই কাগজটিতে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন, ড. কামাল হোসেন এখনো বেচে আছেন। কাজেই কামাল হোসেনের কাছে প্রশ্ন, যে কারণে ইনডিয়াকে পাকিস্তানের সঙ্গে এ শান্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল তার প্রয়োজনীয়তা কি আজ সত্যিই ফুরিয়ে গেছে? ড. কামাল হোসেনের সেই শুভ বোধটি জানি না তার নিজের সঙ্গে সঙ্গেই বয়সের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কি না। প্রজ্ঞাবান যুবক সেদিন যে শান্তির কাগজে দস্তখত করেছিলেন, বুদ্ধিমান বৃদ্ধ তাই আজ উল্টাতে চাচ্ছেন।

যে বুদ্ধিবৃত্তিক অভিভাবকত্বের কথা তুলেছি তারা আজকের এ ক্রান্তিলগ্নে যে প্রশ্নটি প্রথম তুলতে পারতেন তাহলো, সাধারণ ক্ষমা উল্টানোর প্রয়োজনটি আজ কেন সৃষ্টি হয়েছে? সেই সাধারণ ক্ষমার পরে ক্ষমাপ্রাপ্তরা কি সেই একই অপরাধ আবার করেছে বা এ জাতীয় চেষ্টা করেছে? দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হাতে কি এমন কোনো প্রমাণ রয়েছে? এমন প্রমাণ হাতে থাকলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আর তা না থেকে থাকলে ঈর্ষান্বিত, ক্রোধান্বিত ও হতাশ একটি গ্রুপের মনগড়া অভিযোগের পেছনে কেন সারা রাষ্ট্রের মেশিনারিজকে ছোটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে?

ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন অবাস্তব রাষ্ট্রটি অনেক জোড়াতালি দিয়ে টিকতে পারলো না এবং এখনো নিজেরাই আরো ক্ষত বিক্ষত হওয়ার হুমকিতে আছে। **আজ ৩৬ বছর পর আবারো আমাদের সেই কাঠামোতে ফিরে যাওয়ার ভয় ও দুশ্চিন্তা কতোটুকু বাস্তবসম্মত? ৩৬ বছর আগে আমাদের জাতির সামনে যে বিভক্তির হুমকি ছিল আজ কি সেই হুমকি থেকে আমরা মুক্ত হয়ে পড়েছি? কাজেই স্পষ্ট বলা যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের এ জিকির আমাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ওঠেনি, উঠেছে অন্য কারো প্রয়োজনে। এ সরকার যেখানে এসেছে একটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অঙ্গীকার নিয়ে সেখানে তাদের কাধে কেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার দায়িত্বটি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে? এ চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো এ সরকারের মূল কাজটিকে বিঘ্নিত, বাধাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত করা। আমরা যেন আর কোনোদিন গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ফিরে যেতে না পারি এবং ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা থেকে যেন বেরিয়ে আসতে না পারি সে জন্যই এখন এ দাবি তোলা হচ্ছে।**

সারা দেশের ম্যাপটি ছোট করে কাগজে আকা হয় সারা দেশের গঠন ও আকৃতিটি বোঝানোর জন্য। তেমনি বর্তমানের এ বড় ও জটিল বিষয়টি বুঝতে ঘটনাটিকে আরো ছোট করে বর্ণনা করা যেতে পারে। ধরুন, পাকু নামক এক ব্যক্তি বাংলু নামক এক

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে মেরে ফেলেছে। কাজেই পাকুর চির শত্রু ইন্দু বাংলুর মিত্র ও শুভাকাঙ্খী সেজে যায়। পাকুকে অস্ত্রের জোগানসহ সব লজিস্টিক সাপোর্ট, শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে আমু নামক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এক ব্যক্তি। আর পাকুর অস্ত্র বহন করা ও ফুট-ফরমায়েশ খাটা প্রভৃতি কাজ আনজাম দিয়েছে রাজু নামের অন্য এক ব্যক্তি।

অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার পর পর তখনকার বিচারকরা সঙ্গত কারণে পাকুকেই মূল অপরাধী সাব্যস্ত করে। আবার পরিস্থিতির চাপে পড়েই হোক বা কৃতজ্ঞতার নমুনা স্বরূপই হোক ইন্দুর হাতে এ আসামি পাকুকে সোপর্দ করতে হয়। ব্যাপারটি এমন যে বেদনা ছিল একজনের বুকে, আর তা মাফ করার এখতিয়ার বা মালিকানা দেয়া হয় অন্য এক সখা বা সখীর হাতে। সে সখা বা সখী তার নিজের ইচ্ছামতো সুবিধা আদায় করে বিনিময়ে পাকুর সব অপরাধ মাফ করে দেয়। ফলে সহায়তাকারী রাজুর অপরাধও সঙ্গে সঙ্গে মাফ হয়ে যায় বা করে দিতে হয়। এটা নিয়ে মাঝে মধ্যে সামান্য কান্নাকাটি করলেও চলে যায় তিন যুগ বা ছত্রিশ বছর। এবার খুব জোরেশোরে নামা হয়েছে। সে-ই বিচার করা হবে। ভালো কথা, এমন কাজে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে আপত্তিটা উঠেছে– সব লজিস্টিক সাপোর্টকারী আমু, মূল হত্যাকারী পাকুর কথা বেমালুম চেপে গিয়ে রাজুকেই এখন মূল অপরাধী বানানো হচ্ছে দেখে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে 'চাচার কবর একদিকে আর চাচি কাদছেন অন্যদিকে ফিরে'।

এ উদাহরণে রাজু একজন হলেও বাস্তবে ছিল অনেক রাজু। কাজেই চাচিও মনে হয় তাদের মধ্য থেকে তার মনের মতো কোনো রাজুকে ধরেই 'গোলামের পুত' বলে পেটাতে চাচ্ছেন। কেন যেন মনে হচ্ছে চাচার হত্যার প্রতিশোধই মূল উদ্দেশ্য নয়। এতোদিন পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় অনেক পানি গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে (উদাহরণের) এ চাচির মনটিতে আরো অন্য ক্ষোভ জমা হয়েছে। চাচার হত্যাকান্ডে- ভাতিজারা প্রকৃত অর্থেই বেদনাহত হলেও চাচির সামগ্রিক এ কর্মটিকে মেনে নিতে পারছে না। কারণ সেদিনের সেই আমুই এ বিচার অনুষ্ঠানের সব আয়োজনের প্রধান ব্যক্তি বা পৌরহিত্যের দায়িত্ব নিচ্ছেন বলে অনুমিত হচ্ছে। কারণ এ আমুর অনুমোদন ও উৎসাহ ছাড়া এ জাতীয় বিচার কাজ সম্পন্ন করা কখনই সম্ভব হবে না। তাদের এ উৎসাহের আরো একটি কারণ হতে পারে সেদিনের সে আমু তার কাজের ২য় পর্ব শুরু করেছে। সেটি হলো আজকের বিচার পর্ব।

কাজেই সবগুলো অপশক্তিই বর্তমানে আমাদের গণতন্ত্রের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাড়িয়েছে। **তারা সম্মিলিত শক্তিতে যে প্লাবন সৃষ্টি করেছে তাতেই আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, কেউ কেউ তলিয়েও যাচ্ছি। অথচ সাহস করে দাড়িয়ে পড়লে দেখতে পেতাম, এখানে মাত্র হাটু বা কোমরপানি। সাতার জানে না এ ভয়ে কোমরপানিতে অনেকেই নাকি ডুবে মরেছে। আমাদেরও আজ একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। চিহ্নিত কয়েকটি পত্রিকা ও কয়েকটি টিভি চ্যানেলের সর্বাধিক ৫০০ মানুষের বুদ্ধি ও কৌশলের কাছে সারা দেশের প্রজ্ঞা ডুবে যেতে বসেছে। ইন্টেলেকচুয়াল এ ফেইলিউরের কারণেই আমাদের কাছে ১/১১ এসেছে। তা থেকে উৎসাহিত হয়ে তারা পরবর্তী উদ্যোগটি নিয়েছে।**

www.pathagar.com

আমরা সত্য বলতে ভয় পাই। এ ট্র্যাপটা এমন যে, খাটি কথাটি বললে রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যেতে হয়। চিহ্নিত দুটি পত্রিকা ও হাতে গোনা কয়েকটি টিভি চ্যানেল এ প্রজেক্টটিতে নেতৃত্ব দেয়। বাঘের চোখও এরা যোগাড় করে ফেলেন। ইন্টারপোল কর্নেল রশীদকে খুজে বের করতে না পারলেও তারা ঠিকই তাদের সাক্ষাৎকার প্রচার করে ফেলেছেন এবং জিয়াকে খুনি হিসেবে প্রমাণ করে ফেলেছেন। মজার ব্যাপার হলো যে কথাটি তারা শোনাতে চান সেই কথাটিই কর্নেল রশীদ স্বীকার করেন। অথচ পচিশ বছর আগে বলেছিলেন ভিন্ন কথা।

এ ধারার একটি পত্রিকার গত মঙ্গলবারের প্রধান শিরোনামটি ছিল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে বিএনপিও। বিএনপির সাইনবোর্ড আগেই হাইজ্যাক করা হয়েছে। লাল অক্ষরে প্রধান এ শিরোনামটি করে বিএনপির পুরো রাজনীতিকেও যেন হাইজ্যাক করে ফেলা হয়েছে। কাজেই এখন বিএনপিকে দিয়ে করানো হবে আওয়ামী লীগের রাজনীতি। খেলাটি আরো ভালোভাবে জমতো এ বিএনপিকে দিয়ে যদি কর্নেল রশীদের সাক্ষীমতো এর দায়-দায়িত্ব স্বীকার করানো যেতো। কে জানে খালেদার আশীর্বাদটুকু আশামতো না জুটলে এ জিয়া প্রেমিকরা অদূর ভবিষ্যতে জিয়ার মরণোত্তর ফাসিও দাবি করে বসতে পারেন। পচিশ বছরের আরো কম সময়ের মধ্যেই এদের কাউকে হয়তো দেখা যাবে চ্যানেল আইতে এমনই কোনো বোমা ফাটাচ্ছেন।

কোনো দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র চালু করতে পারলে সেখানে ফ্যানাটিসিজম বা কোনো মৌলবাদ টিকতে পারে না। এ মৌলবাদ শুধু দাড়িওয়ালা তালেবান নয়, দাড়ি ছাড়া তালেবান বা বাকশালের মাধ্যমেও আসতে পারে। গণতন্ত্র এ দুটিকেই চেক দিতে পারে। উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্মভিত্তিক দলগুলো উপকৃত হয়ে যাবে বলে যারা ভয় পাচ্ছেন তারাও গণতন্ত্রের মূল স্পিরিটটি বুঝতেই সক্ষম হচ্ছেন না। কারণ ইনডিয়ার গণতন্ত্র যেমন রামরাজ্যের প্রভাব অগ্রাহ্য করতে পারবে না, আমেরিকার ডলার যেমন গডের ওপর বিশ্বাস ছাড়া টিকতে পারবে না– তেমনি আমাদের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ধর্মের প্রভাব থাকবেই।

বর্তমানে দৃশ্যমান বিভিন্ন তন্ত্র থেকে প্রকৃত গণতন্ত্রে ফিরতে হলে জিয়ার মতো কিছু সাহসী গণতন্ত্র প্রেমিক দরকার। যে সাহসী প্রেমিকের মতোই বলতে পারবে, যদি কাউকে ভালোবাসো তবে তাকে মুক্ত করে দাও। সে যদি ফিরে আসে ...।' প্রেমের এ বাক্যটি সম্ভবত গণতন্ত্রের বেলায় আরো বেশি প্রযোজ্য।
কারণ সংকীর্ণ প্রেম দিয়ে আর যাই আসুক, কখনই গণতন্ত্র আসবে না।

দৈনিক যায়যায়দিন, ১৬ নবেম্বর, ২০০৭
চীন প্রবাসী বিশিষ্ট কলামিস্ট

www.pathagar.com

স্বাধীনতার বিরোধিতা এবং যুদ্ধাপরাধের শাস্তি

।। মোঃ নূরুল আমিন।।

এক.

জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহে একটা উন্মত্ত Hate Campaign শুরু হয়েছে বলে মনে হয়। গত ২৫শে অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপ শেষে জামায়াত সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ কর্তৃক সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে যুদ্ধ অপরাধী এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের সম্পর্কে প্রদত্ত একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে আপাতঃদৃষ্টিতে বিদ্বেষ ছড়ানোর এই অভিযান শুরু হয়েছে বলে মনে হয়। জনাব মুজাহিদ বলেছিলেন যে, দেশে বর্তমানে কোনও যুদ্ধাপরাধী নেই, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৫ জন যুদ্ধ অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল তারা সবাই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান তাদের ক্ষমা করে দেন এবং পাকিস্তানে তাদের ফেরত পাঠান। জামায়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগকে তিনি উদ্ভট, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের কথা যারা বলছেন তারা সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বলছেন বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেছেন যে, এখন অতীত নিয়ে কথা বলা ঠিক হবে না। কারণ, অতীতে দায়িত্বশীল দলের দায়িত্বহীন আচরণের কারণে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থা থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে শিক্ষা নেয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপে জামায়াত কি বললো, নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কে কমিশনকে তারা কি পরামর্শ দিলেন, কমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের মতামত কি ছিলো সিংহভাগ পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে তার কোনও তথ্য আসেনি। তারা যেভাবে সংবাদটি পরিবেশন করেছেন তাতে মনে হয়েছে যে, জনাব মুজাহিদ ভিমরুলের চাকে ঢিল মেরেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয়েছে যে, তারা সিন্ডিকেট করে রিপোর্ট করেছেন এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য পূর্ব থেকেই লোকজন রেডি করে রেখেছেন।

তারা জামায়াত রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানালেন। তীব্র প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জামায়াতকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না দেয়া, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জামায়াত নেতাদের বিচারের দাবি জানালেন। সাজেদা চৌধুরী বললেন, ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকতা পায় না, জেনারেল শফিউল্লাহ বললেন, অভিযোগের দরকার নেই, সরকারের উচিত যেভাবে চাঁদাবাজির অভিযোগে রাজনৈতিক নেতাদের ধরে ধরে জেলে পুরা হচ্ছে সেভাবে জামায়াত নেতাদের জেলে পুরে পরে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে বিচারের ব্যবস্থা করা দরকার। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইব্রাহিম বললেন, জামায়াত সকল সীমা অতিক্রম করেছে, তাদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তিনি জামায়াত-শিবিরের ৫০ বছরের কম বয়সী নেতাকর্মীদের প্রতি সিনিয়র নেতাদের পদত্যাগ দাবি করার আহ্বান জানিয়েছেন। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন অনুসারে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে জামায়াত নেতাদের বিচার দাবি করেছেন। ড. কামাল হোসেন দেশের প্রচলিত আইনে জামায়াত নেতাদের বিচার চেয়েছেন। আবার মীর শওকত দেশের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলোর জন্য স্বাধীনতা বিরোধীদের দায়ী করেছেন। কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঘাতক দালাল কমিটির সাথে অনুষ্ঠিত সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর এক বৈঠকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে একটি মোর্চা গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়েছে, জেনারেল এরশাদও জামায়াত নেতাদের বিচার দাবি করেছেন।

পত্র পত্রিকার সংবাদস্তম্ভ, প্রতিবেদন, টিভি চ্যানেলগুলোতে আয়োজিত এ সংক্রান্ত টকশো প্রভৃতি দেখে আমার মনে হয়েছে যে, জামায়াত ছাড়া বাংলাদেশে আর কোনও সমস্যা নেই। জামায়াত না থাকরে দ্রব্য মূল্য কমে যাবে ৪০ টাকার আটা ১০ টাকা হবে, ৩২ টাকার চাল ৮ টাকা, ১০০ টাকার সয়াবিন তেল ৪০ টাকায় বিক্রি হবে। দেশে সন্ত্রাস নৈরাজ্য কিছুই থাকবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। যে হিংসা-বিদ্বেষ, সন্ত্রাস ও অসহনশীলতার কারণে দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ হলো এমারজেন্সী আমলে একটি গোষ্ঠির তরফ থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেশকে অস্থিতিশীল করার অশুভ এই উদ্যোগ দেখে অনেকেই হতবাক হয়েছেন। কেউ কেউ বলছেন, একটা ইস্যু তৈরি করে দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে জন্য একটি অদৃশ্য মহল থেকে ইতোমধ্যে ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি দলসমূহের অকর্মা নেতানেত্রী, বেকার সাংস্কৃতিক কর্মী ও ভাড়াটে লোকদের দিয়ে এ কাজ শুরু হয়েছে। মাত্র দু'মাস আগেও যারা চা-সিগারেটের পয়সার জন্য বন্ধুর পকেট হাতড়াতো তাদের অনেকে এখন ডেকে চা খাওয়ায়। কোন্‌টা সত্য আমি জানি না তবে আমার কাছে বিষয়টি অদ্ভুত বলেই মনে হয়।

বাংলাদেশে যারা যুদ্ধাপরাধ করেছেন তাদের বিচার চাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। খুন, হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটের সাথে যারা জড়িত তাদের মাফ করা যায় না। আমি যতদূর জানি, জামায়াত কখনো তাদের সাফাই গায়নি। জনাব মুজাহিদ বলেছেন যে, তৎকালীন সরকার যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা করেছিলেন এবং তাতে পাকিস্তানী আর্মির ১৯৫ জন সদস্যের নাম ও অপরাধ চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের ক্ষমা করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। যারা তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন ও করছেন তাদের কেউই এই তথ্যের বিরোধিতা করেননি, আর বিরোধিতা করতেও পারেন না। কেননা এটা ঐতিহাসিক সত্য। যুদ্ধ করেছেন যারা, তারা মূল অপরাধী। জিল্লুর রহমান, তোফায়েল, সাজেদা চৌধূরী, জেনারেল শফিউল্লাহ, ড. কামাল হোসেনসহ যারা আজ ৩৬ বছর পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাচ্ছেন শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকার যখন তাদের মাফ করে দিলো তখন তারা প্রতিবাদ করলেন না কেন? এখন আবার ফেলে দেয়া থুথু মুখে তুলে চাটতে চাচ্ছেন কেন? মূল অপরাধীদের ছেড়ে দিয়ে ঐ সময় তাদের সহযোগীদের বিচার করার তো কোনও বাধা ছিল না। সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র তখন তাদের হাতে ছিল। প্রত্যেকটা গ্রামে তাদের কমিটি ছিল। ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ইউনিয়ন রিলিফ কমিটি করা হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগ নেতারাই এই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন। মূল যুদ্ধাপরাধীদের সহযোগিতা যদি কেউ করে থাকে তাদের তালিকা এবং অপরাধের ফিরিস্তি ও আলামত সংগ্রহের পথে তখন তো কোনও সমস্যা ছিলো না। এই তালিকাটা কেন তৈরি করা হয়নি তার জবাব কে দেবে? বলা হচ্ছে ৩০ লাখ লোক মারা গেছেন। এরা আমাদের দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাদের রক্তে গড়া বাংলাদেশের আলো-বাতাসে আমরা বেঁচে আছি, সুবিধা ভোগ করছি। তাদের একটা তালিকা তৈরী করা কি আমাদের দায়িত্ব ছিল না। এই তালিকা থাকলে ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের স্মরণ

www.pathagar.com

করতে পারতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যারা ক্ষমতায় এলেন তারা লুটপাটের সুযোগ পেলেন, এই তালিকাগুলো করার সুযোগ পেলেন না, এই কথা কি বিশ্বাস করা যায়? নাকি ভবিষ্যতে কোনও দল বা গোষ্ঠীকে অপবাদ দেয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করা হয়নি? এটা আমার কছে বিস্ময়ের ব্যাপার যে, জনাব মুজাহিদের বক্তব্যে যারা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন তারা কিন্তু কেউই তার বক্তব্য বা তথ্য খণ্ডাবার চেষ্টা করেননি। এদের পরিচয় নির্ণয় করতে গিয়ে যখন দেখি যে এরা সবাই আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সদস্য, তখন তাদের এ পরিচয় মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় একটি জাতীয় ইস্যুকে নোংরা রাজনীতির পাঁকে ফেলে সুবিধা আদায়ের প্রয়াস বলে মনে হয়। রাজনীতিতে বিশেষ করে গণতান্ত্রিক পরিবেশে মতানৈক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই। পারস্পরিক সহনশীলতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অংশ। প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করা, তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো যাদের মিশন, ভিশন ও গোলের (Mission, Vission, Goal) অন্তর্ভুক্ত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে তারা বিশ্বাসী হতে পারেন না। আওয়ামী লীগ তার আচার আচরণের মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করেছে। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তারা বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থানকে হাই লাইট করে বিশ্বজনমতকে ইসলামী সংগঠনগুলোর ব্যাপারে ভীত ও সন্দিগ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে পুস্তক পুস্তিকা তৈরি করে বিশ্বব্যাপী বিতরণ করেছে। ক্ষমতা হারিয়ে তারা এ দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণের জন্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অনেকগুলো মিডিয়াকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু একটা অসত্যকে সত্যের প্রলেপ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

জামায়াত বিরোধী ও ইসলাম বিরোধী শক্তি সন্ত্রাসের সাথে জামায়াতের সম্পর্ক খুঁজে পায়নি। আওয়ামী শাসনামলে সন্ত্রাসীদের যে তালিকা তৈরী করা হয়েছিল তার ৭০% আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠন তথা ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগের সাথে এবং অবশিষ্টরা অন্যান্য দলের সাথে জড়িত ছিল বলে পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে; এই তালিকায় জামায়াত বা শিবিরের কোনও নেতা-কর্মীর নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় যারা ধরা পড়েছিল তাদেরও জামায়াত পরিচিতি ছিল না। এরপর যৌথবাহিনীর অভিযানে যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যেও জামায়াত-শিবির বহির্ভূত ব্যক্তিরাই হচ্ছে প্রধান। জেএমবির জঙ্গি কানেকশানেও জামায়াতকে পাওয়া যায়নি। দেশের পুলিশ বিডিআর যৌথবাহিনী যে শুধু তা পায়নি তা নয়। বিদেশীরাও চেষ্টা করে তা পায়নি। গত বছর মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচারও একথা বলে গেছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতের জঙ্গী কানেকশানের ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন যে, জামায়াত সন্ত্রাস জঙ্গী তৎপরতার সাথে জড়িত রয়েছে এ ধরনের কোনও প্রমাণ তাদের হাতে নেই। ওয়ান ইলেভেনের পর দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের অঙ্গসংগঠনসমূহে শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ হাজার হাজার নেতা-কর্মী, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। তাদের বিভাগ, জেলা, উপজেলা এমন কি ইউনিয়ন পর্যায়েরও অনেক নেতা-কর্মী এখনো পর্যন্ত পলাতক রয়েছেন। কিন্তু এই অভিযান জামায়াতকে তেমন স্পর্শ করেনি। এটা অনেকের কাছে অসহ্য হয়ে পড়ে। রাম বাম বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকরা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। তারা কেন জামায়াতের লোকদের ধরা হচ্ছে না এ নিয়ে দুদক চেয়ারম্যান, দুর্নীতি বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং কয়েকন উপদেষ্টাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। তারা জামায়াতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ পাচ্ছেন না বলে জানান এবং তাদেরকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপনের পরামর্শ দেন, এই অভিযোগ দায়েরে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার গ্লানি তারা আর ধরে

www.pathagar.com

রাখতে পারছে না। তারা দেখেছেন যে তাদের পছন্দের দলগুলা যেখানে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রত্যেকটি স্তরে ক্ষত বিক্ষত বিব্রত এবং ভাঙ্গা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না সেখানে জামায়াত অক্ষত ও সর্বত্র বিস্তৃত এবং রাজনীতি না থাকা সত্ত্বেও তাদের বর্ধিত ইমেজ সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে আরো শাণিত করছে তখন মাথা খারাপ না হয়ে কি আর পারে? কাজেই তার অগ্রগতিকে প্রতিহত না করে কি আর পারা যায়? নিবন্ধের শুরুতে আমি উন্মত্ততা শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম, উন্মত্ততা এখানেই।

জামায়াত নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি আদর্শবাদী দল, নিছক কোনও রাজনৈতিক দল নয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক একটি আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতাকর্মীদের জীবন যেমন স্বচ্ছ, তেমনি স্বচ্ছতা রয়েছে তাদের কাজ কর্মে। এই দলে জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, আবু তাহের, ইকবাল, হাসানাত আব্দুল্লাহ, আলতাফ গোলন্দাজ, আওরঙ্গ ও কালা জাহাঙ্গীরের মতো লোক নেই। জামায়াতের কোনও নেতা কিংবা জামায়াত সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির অথবা শ্রমিক সংস্থা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কোনও এক্টিভিস্ট চাঁদাবাজি বা টেন্ডারবাজির মাধ্যমে অবৈধ ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন, বাড়ি বা শিল্প-কারখানা দখল করেছেন এ ধরনের প্রমাণিত কোনও দৃষ্টান্ত নেই। তাহলে কেন এই অপপ্রচার? এখন মূল প্রসঙ্গে আসি।

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় ছিল। এই মেয়াদে তারা কলাবরেটারদের কি করেছেন তার উপর পরবর্তী পর্যায়ে আমি কিছুটা আলোকপাত করবো। তাদের পর প্রেসিডেন্ট জিয়া আসলেন, এরপর আসলেন ক্যু করে জেনারেল এরশাদ। তিনি নয় বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। তিনি যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার করেননি, উদ্যোগও নেননি, ৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় গেল এবং ৯৬ সালে পুনরায় আওয়ামী লীগ ৫ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসলো। তারা দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের (?) চিহ্নিত করে বিচারের উদ্যোগ নিলেন না। কারা স্বাধীনতা বিরোধী তাও চিহ্নিত করলেন না। অবশ্য তারা দেশেকে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ এই দু'টি শিবিরে বিভক্ত করে জামায়াত, বিএনপি ও ইসলামী দলগুলোকে বিপক্ষ শক্তি বলে প্রচারণা চালাতেন। তারা এখন কেয়ারটেকার সরকারের উপর যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের দায় চাপাতে চাচ্ছেন। নীরব তারা ফেরত পাঠানো ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের (?) জন্য বাংলাদেশের হাতে অর্পণ করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করার ব্যাপারে? ৩৬ বছর পর্যন্ত এই বিচার না করে তারা যে অপরাধ করেছেন তার জন্য তারা জাতির কাছে এখনো ক্ষমাও প্রার্থনা করেননি।

এখন অন্য প্রসঙ্গে আসি। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ৩৯ জন রাজনৈতিক নেতার নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলেন (দেখুন Notification no. 403-1mn/III Ministry of Home affairs, Immigration Branch-III, Dated, Dacca 18, 4, 1973), এই প্রজ্ঞাপনে তাদের নাগরিকত্ব বাতিলের অনুকূলে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল তা ছিল দেশ মুক্ত হবার পূর্ব থেকে বিদেশে অবস্থান করা। প্রজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ :

" Whereas it appears that the persons specified below have been staying abroad since before the liberation of Bangladesh and by their conduct

www.pathagar.com

cannot be deemed to be citizen of Bangladesh.
And whereas the said persons have continued to be the citizens of Pakistan: Now, therefore, the Government declares under Article 3 of the Bangladsh Citizenship (Temporary Provision) order 1972 (P.O.No. 149 of 1972), that the persons specified below do not qualify themselves to be the citizens of Bangladesh.....

অর্থাৎ যেহেতু এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব থেকেই বিদেশে অবস্থান করে আসছেন এবং তাদের আচরণ দ্বারা তাদের বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য করা যায় না এবং যেহেতু বর্ণিত ব্যক্তিরা পকিস্তানের নাগরিকত্ব অব্যাহত রেখেছেন।
সেহেতু সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধি) আদেশ ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদের আওতায় (১৯৭২ সালের পি.ও.নং-১৪৯) ঘোষণা করেছেন যে, নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের নাগরিক হবার যোগ্যতা অর্জন করে না।.....

বলাবাহুল্য, এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যে ৩৯ জন নেতানেত্রীকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন, তাদের মধ্যে মাত্র ৯ জন ছিলেন জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা জামায়াতের সমর্থক, দু'জন মহিলাসহ অবশিষ্টরা ছিলেন মুসলিম লীগের দুই গ্রুপ, পিডিপি, নেজামে ইসলাম পার্টি, কেএসপি, পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দল এবং স্বতন্ত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ পায়নি। অধ্যাপক গোলাম আযমসহ যে ৯ জন জামায়াত নেতা ও সমর্থককে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা আবদুর রহীম ছাড়া সবাই দেশেই ছিলেন, স্বাধীনতার পূর্ব থেকে বিদেশে অবস্থান করেননি। এদের মধ্যে অন্যতম ব্যারিস্টার কোরবান আলীকে হাতির পুলের নিকট ১৭ ডিসেম্বর অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা গুলী করেছিল। গুলীটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ায় তিনি বেশ কিছু দিন তার বন্ধু আওয়ামী লীগ নেতা জনাব নূরুল ইসলামের বাড়িতে ছিলেন। বলাবাহুল্য, জনাব ইসলামের কন্যা সেগুফতা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্যও ছিলেন। অনুরূপভাবে অধ্যাপক ইউসুফ আলী, অধ্যাপক আব্দুল খালেক, এডভোকেট শেখ আনছার, মাস্টার শফিকুল্লাহ প্রমুখ কেউই বিদেশে ছিলেন না, এদেশের মাটিতেই ছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকার তাদের প্রবাসী বানিয়ে তাদের আচরণকে নাগরিকত্বের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাদের অপরাধ চিহ্নিত করা হয়নি, তাদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়নি। বাংলাদেশে জামায়াত পুনরুজ্জীবিত হবার পর মাওলানা আবদুর রহীম ও ব্যারিস্টার কোরবান আলী জামায়াতে যোগ দেননি। আবার এই নয় জনের মধ্যে দু'জন ছাড়া আর কেউই বেঁচে নেই। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে নাগরিকত্ব বাতিলের বিষয়টি সরকার পুনর্বিবেচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে নাগরিকত্ব পুনর্বহালের আবেদন আহ্বান করে অল্প কয়েকজন ছাড়া আর সবার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ আদালতের মাধ্যমেও নাগরিকত্ব ফেরত পান এবং হামিদুল হক চৌধুরীসহ যাদের সম্পত্তি সরকার অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তাদের সম্পত্তি সরকার ফেরত দিতে বাধ্য হন। অধ্যাপক গোলাম

www.pathagar.com

আযম ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেননি। ১৯৭৮ সালে তিনি নাগরিকত্ব পুনর্বহালের আবেদন করে মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন এবং সরকারি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু সরকার তার বিষয়টি অন্যায়ভাবে ঝুলিয়ে রাখে এবং ১৯৯২ সালে আওয়ামী লীগ ও সমমনা দলগুলোর উদ্যোগে গঠিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির দাবি ও নৈরাজ্যকর আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জামায়াতের সমর্থনে গঠিত তৎকালীন বিএনপি সরকার তাকে গ্রেফতার করে। এরই আলোকে তার পক্ষ থেকে আদালতে মামলা করা হয়। এই মামলায় জামায়াত ও ইসলামী রাজনীতি বিরোধী সকল শক্তি একত্রিত হয়ে তাকে স্বাধীনতার শত্রু, হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটের প্রতিভূ এবং যুদ্ধাপরাধী প্রমাণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ড. কামাল হোসেন ঘোষণা করেন যে যদি অধ্যাপক গোলাম আযম নাগরিকত্ব পান তাহলে তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু তাদের জন্য পরিতাপের বিষয় ছিল এই যে তারা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেননি এবং মহামান্য আদালত তাকে তার জন্মগত অধিকার ফেরৎ দেন। অবশ্য আওয়ামী লীগের আশির্বাদপুষ্ট ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি রেসকোর্সে গণআদালত বসিয়ে শাসনতান্ত্রিক আদালতের উপর একটা প্রতিশোধও নিয়েছিল। এই তথাকথিত গণআদালত অধ্যাপক গোলাম আযমকে ফাঁসিও দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল নোংরা রাজনীতি ও কিছুসংখ্যক প্রতিহিংসাপরায়ণ দেউলিয়া রাজনীতিকের খেলা। অনেকেই মনে করেছিলেন যে, এই খেলার সেখানেই সমাপ্তি ঘটেছে, আসলে তা ঘটেনি।

এটা অনস্বীকার্য যে পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে এ দেশের আপামর জনসাধারণের মুক্তি প্রয়াসের অভিব্যক্তি ঘটেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে। স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে অসহযোগ আন্দোলন ছিল এর প্রস্তুতি পর্ব। এই সময় আওয়ামী লীগকে দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষ সমর্থন যুগিয়েছিল। কিন্তু ২৫ শে মার্চ এ দেশের নিরস্ত্র মানুষের উপর সশস্ত্র পাকিস্তানী বাহিনী যখন ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং গণহত্যা শুরু করলো তখন এই দলটি সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান এমনকি তাদের অভয় দিয়ে মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব পালন করতেও ব্যর্থ হয়। শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধরা দেন এবং তাকে তারা গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ ভারতে পালিয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে মরহুম তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল প্রমুখ ভারত সরকারের সহযোগিতায় মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় অস্থায়ী সরকার গঠন করে। জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নেবার জন্য দেশকে বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন। অনেকে মনে করেন যে, ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশের ভবিষ্যৎ নির্নয় এবং রাজনৈতিক অবস্থার যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতা যেমন ছিল আওয়ামী লীগের তেমনি ছিল অন্যান্য দলের। ইয়হিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণার পর থেকে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে এবং শেখ মুজিবের নির্দেশে দেশ একটি পাল্টা সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা ঘোষণা হয় ২৫ শে মার্চ সামরিক হস্তক্ষেপের পর। এই দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের অধীনে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সংলাপ নিয়েই ব্যস্ত ছিল, যদিও ছাত্র নেতৃত্ব দেশকে স্বাধীন করার পথে অনেক দূর

www.pathagar.com

এগিয়ে গিয়েছিল। (দেশবাসী শেখ মুজিবের একটি ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলেন। আর শেখ মুজিব ছিলেন ২৫ শে মার্চ রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা সম্বলিত জেনারেল পীরজাদার একটি টেলিফোনের অপেক্ষায়- দেখুন আওয়ামী লীগ নেতা এমএ মোহায়মেনের 'ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর' এবং মাহবুবুল আলমের 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস')। তার মাথায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কোনও চিন্তা ছিলো না। সংলাপ ব্যর্থ হলে পরবর্তী পরিস্থিতি সামলে দেয়ার প্রস্তুতিও ছিলো না।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। আওয়ামী লীগ যে ভোট পেয়েছিল তা ছিল মোট ভোটারের ৩৩ শতাংশ এবং এতেই তারা জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মাধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। জামায়াত ৬% ভোট পেয়েছে কিন্তু কোনও আসন পায়নি। যখন দেশসংকটের মুখে পড়লো, দেশের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়লো, স্বাধীনতা ঘোষণার চাপ সহনশীল পর্যায় অতিক্রম করলো এবং সামরিক শাসকদের একগুয়েমী স্পষ্টতর হয়ে উঠল তখন আওয়ামী লীগের উচিত ছিল সবগুলো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপন করা এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করা। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা করেনি। তা যদি করা হতো তাহলে স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে কার কি অবস্থান তা পরিষ্কার হয়ে যেতো এবং আজকে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে যে বিভ্রান্তি তার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যেতো। স্বাধীনতার ঘোষণা যখন আসলো তখন দেশ থেকে নেতারা পালিয়ে গেলেন, কেউ গ্রেফতার হলেন। যারা দেশে ছিলেন ভারতে যেতে পারেননি তারা এদেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছেন। অনেকে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একাধিক কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। একটি বড় দল হিসেবে তার Coordinating এবং Cooperative চরিত্র ছিল না বললেই চলে। তার ফ্যাসিবাদী চরিত্র, প্রতিপক্ষের দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ-সংশয়, মিটিং-মিছিলে হামলার প্রবণতা দেশের একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি থেকে তাকে আলাদা করে রেখেছিল। আওয়ামী লীগের মাত্রাতিরিক্ত ভারতপ্রীতি এবং দেশপ্রেমিক দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ভারতভীতিও এর সাথে যুক্ত হয়েছিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে রাখার প্রতি দলটির মোহও এর জন্য কম দায়ী ছিল না। প্রখ্যাত ভারতীয় নেতা শান্তিময় রায়ের ভাষায়, "মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে ছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। অনেকেরই বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগ একাই মুক্তিযুদ্ধ করবে। অন্য কোন দল বা গোষ্ঠী করুক তা হবে না। আবার আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাত থেকে অন্য কোন দলের হাতে যাক কিংবা তারা এর অংশিদার হোক এটাও ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাদের ভয় ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত বিরোধী কোনও দল বা শক্তি যদি সম্পৃক্ত হয় তা হলে ভারতের স্বাধীনতাকামী জাতিসত্তাগুলোকে তারা উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ পেতে পারে এবং এর ফলে সে দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠতে পারে এবং তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম একমাত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হবে। ফলে যে সমস্ত দল, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী আওয়ামী লীগের আস্থাভাজন ছিল না তারা ইচ্ছা করলেও মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। আজকের আওয়ামী লীগ নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি তখন

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাত্রলীগ বা আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। এ কারণে তাকে মার খেয়ে ভারত থেকে ফিরে আসতে হয়েছে এবং তারই বড় ভাই তৎকালীন ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তার সুপারিশে দৈনিক পূর্বদেশে খণ্ডকালীন চাকরী নিয়ে সমগ্র লিবারেশান পিরিয়ডটা ঢাকাতে কাটাতে হয়েছে। এই সময় তিনি ইবনে সিদ্দিক ছদ্মনামে ভারত ও আওয়ামী লীগ বিরোধী যে সমস্ত নিবন্ধ লিখেছেন তা আজো দৈনিক পূর্বদেশে সংরক্ষিত আছে। আসলে আওয়ামী লীগ বিরোধী হওয়া কিংবা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অর্থ স্বাধীনতা বিরোধী হওয়া নয়। আবার আমি আগেই বলেছি, আওয়ামী লীগ ও ভারত সরকারের মনোরঞ্জন ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করাও কঠিন কাজ ছিল। মাওলানা ভাসানীর মত একজন জাতীয় নেতাও ভারতে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন বা নেতৃত্বের কাজ করতে পারেননি। তিনি আসামে যাবার পর থেকে জাতীয় সরকারের Protective Custody-তে আটক ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে তিনি যাতে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে না পারেন তার জন্য ভারত সরকার অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

দুই.

দেশের ভেতরের এবং বাইরের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সামনে না এনে একাত্তর সালে কার কি ভূমিকা ছিল তা বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন কাজ এবং এ কারণেই শেখ মুজিব জীবিত থাকা অবস্থায় এসব ঘাটাঘাটিতে যাননি: Forget and Forgive নীতিতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে নতুনভাবে শুরু করতে চেয়েছিলেন। এত বছর পর ইতিহাস ও ঘটনা পরম্পরা সম্পর্কে অজ্ঞ যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ইস্যু সৃষ্টির প্রয়াস দুরভিসন্ধিমূলক বলেই মনে হয়।

এটা নিঃসন্দেহে সকল প্রকার নৈতিকতাবিরোধীও। আর্মি একশনের পর আওয়ামী লীগ নেতারা পালিয়েছেন তাদের কেউ মারা যাননি। মরেছেন এখানে যারা ছিলেন তারা। যদি জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোর নেতৃবৃন্দও পালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু কোথায় যেতেন? আমি আগেই বলেছি আওয়ামী বলয়ের বাইরের কারোর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সহজ ছিল না। খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন মস্কোপন্থী ন্যাপ, কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের মুরব্বী ছিল বলেই মস্কোপন্থীরা ভারত যেতে পেরেছে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে পিকিংপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির দু'একটি গ্রুপের দু'একজন নেতাকে ভারতে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়েছে। এ পর্যায়ে কাজী জাফর আহমদের একটি সাক্ষাৎকার প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, *"পয়লা জুন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার ঘোষণার কপিসহ আমি, রাশেদ খান মেনন এবং হায়দর আকবর খান রনো কোলকাতায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের অংশ গ্রহনের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তি বাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। আমরা বলি যে..... আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এ জন্য জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কাউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে জনাব তাজুদ্দিন জানান যে তাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর নির্ভর করতে হবে। আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি। দেশে ফিরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে*

www.pathagar.com

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলং এর এক ডাক বাংলায়। সেখানে আমাকে সাত দিন রাখা হয়।..... সাত দিনব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়" (দেখুন কাজী জাফরের সাক্ষাৎকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০১-২০২)।
মাওলানা ভাসানী আসাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত প্রবেশের আগে অবস্থা জানার জন্য তার কয়েকজন সাথী সীমান্ত পার হয়েছিলেন। মাওলানার মুরিদ একজন অসমীয় মুসলমান তাদেরকে একজন পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে নিয়ে গেলো। পঞ্চায়েত প্রধান যখন জানলেন যে, তারা আওয়ামী লীগের লোক নন, ন্যাপের লোক তখন তিনি তাদের পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া বর্ডার পার হবার হুকুম নেই এবং তারা ফিরে গেলেই ভাল কেননা জানাজানি হয়ে গেলে পরে অসুবিধা হতে পারে (দেখুন সাইফুল ইসলামের 'স্বাধীনতা, ভাসানী ভারত', পৃষ্ঠা-৮)। শুধু তাই নয় অলি আহাদের মতো আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ নেতাও নিরাপত্তাহীনতার কারণে ভারত থেকে দেশে পালিয়ে এসেছিলেন (দেখুন 'জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫' অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ৫০৭)

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সেক্রেটারি জেনারেল মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়াকেও ভারত গিয়ে ওয়ারেন্টের তাড়া খেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয়েছে (দেখুন শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত "মাওলানা ভাসানী : রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম", পৃষ্ঠা ২৪) এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামী পন্থী দল ও গ্রুপগুলোর জন্য ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক ছিল। ঐতিহাসিক বৈরিতার কারণে তাদের পক্ষে ভারত যাওয়া সম্ভবপরও ছিল না। এ কারণের শিকার হয়ে তাদের অনেককে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের অভ্যন্তরে উভয় সংকটের মোকাবিলায় এক অস্বস্তিকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। আওয়ামী লীগ নেতারা জান নিয়ে পালিয়ে গেলেন, নির্মম পাকিস্তানী বাহিনীর তোপের মুখে পড়লো দেশের মানুষ এবং অভ্যন্তরে থাকা নেতৃবন্দ। অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষায়,
"ভারত বিরোধী ও ইসলামপন্থীরা উভয় সংকটে পড়ে গেলো। যদিও তারা ইয়াহিয়া সরকারের সন্ত্রাসবাদী দমন নীতিকে দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেন তবুও এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কোন সাধ্য তাদের ছিল না। বিরোধিতা করতে গেলে তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকেও অন্যদের মতো ভারতে চলে যেতে হতো যা তাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।.... তারা একদিকে দেখতে পেলো যে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে ইয়াহিয়া সরকারকে বিব্রত করার জন্য কোন গ্রামে রাতে আশ্রয় নিয়ে কোন পুল বা থানায় বোমা ফেলেছে, আর সকালে পাক বাহিনী গিয়ে ঐ গ্রামটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা রাতে কোন বাড়ীতে উঠলে পরদিন ঐ বাড়িতেই সেনাবহিনীর হামলা হয়ে যায়। এভাবে জনগণ এক চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে গেল। ভারত বিরোধী ও ইসলামপন্থীরা শান্তি কমিটি কায়েম করে সামরিক সরকার ও অসহায় জনগণের মধ্যে যোগসূত্র কায়েম করার চেষ্টা করলেন যাতে জনগণকে রক্ষা করা যায় এবং সামরিক সরকারকে জুলুম করা থেকে যথাসাধ্য ফিরিয়ে রাখা যায়।..... একথা ঠিক যে শান্তি কমিটিতে যারা ছিলেন তাদের সবার চারিত্রিক মান এক ছিলো না। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা সুযোগ মত অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্বার্থ আদায় করেছে।" (পলাশী থেকে বাংলাদেশ, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা.১৮)

বলাবাহুল্য মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণার আগ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করেছে এবং এই ধরনের যুদ্ধের কৌশল হিসেবে চোরাগুপ্তা হামলা করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থাপনা পুল কালভার্ট ধ্বংস করে এবং সুযোগ মত মিলিটারী ও

www.pathagar.com

প্যারামিলিটারী ক্যাম্প, থানা প্রভৃতিতে হামলা করে শত্রু বাহিনীকে দুর্বল করে দেয়াই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাদের এই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সামলানোর যে বিরাট কাজ এবং ধকল সেটা কি কেউ কখনো চিন্তা করেছেন? মানবতা বিরোধী অপরাধ যদি কেউ করে থাকেন তাহলে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার বিচার হবে। অভিযোগের অনুকূলে যদি পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, আলামত সবকিছুই থাকে তাহলে শাস্তি যাদের প্রাপ্য তাদের শাস্তি না দেয়াটা এক ধরনের জুলুম এবং অবিচারের সামিল। কিন্তু অবস্থা বিবেচনা না করে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেই তাকে রাজাকার, আলবদর, যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতাবিরোধী বলে অপবাদ দিবেন, তার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবেন তা কেমন করে হয়। এ আচরণ সভ্যতার মানদণ্ডে টিকে না।

জনাব মুজাহিদ বলেছেন, দেশে স্বাধীনতাবিরোধী নেই। তার এই কথাটি দেশ জাতি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে অপমান করলো তা আমার মত অনেকেই বুঝতে পারেন না। দেশে যদি স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি কিংবা সংগঠন থাকে তাহলে দেশ চলে কিভাবে? তাদের স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা সম্পর্কে কি সরকার, সরকারের অধীনে কর্মরত পুলিশ, বিডিআর ও প্রতিরক্ষা বাহিনী কিংবা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অবহিত নন? তারা কেউ জানলেন না, তাদের বিরুদ্ধে কোনও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাও নেই, তাহলে দেশে স্বাধীনতাবিরোধী লোক আছে একথা আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন? তারা কারা কতজন, স্বাধীনতাবিরোধী কি কি কাজ করেছেন, তার ফিরিস্তি ও প্রমাণ না দিয়ে একটি দল বা গোষ্ঠীর প্রতি আঙ্গুল তোলা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক নোংরামী এবং দলীয় সংকীর্ণতার পরিচায়ক। '৭১ সালের আওয়ামী লীগ বিরোধী ভূমিকাকে স্বাধীনতার বিরোধিতা গণ্য করে দেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করে। এই সময় যুদ্ধ ফেরত মুক্তিবাহিনী বিশেষ করে মুজিব বাহিনীর সদস্যরা শহরের অলিতে-গলিতে এবং গ্রামের আনাচে-কানাচে তল্লাশি চালিয়ে ৯৭ হাজার লোককে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ৪২ হাজার লোককে তারা গুলী করে, ব্রাশফায়ার করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্য থেকে ৩৫ হাজার লোককে তারা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন, অবশিষ্ট ২০ হাজার লোককে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা মোটা অংকের পয়সা খেয়ে ছেড়ে দেয়ার বহু তথ্য প্রমাণ আছে। যে ৩৫ হাজার লোককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে দালালী এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। এদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল রাজাকার। বলাবাহুল্য রাজাকার সম্পর্কে অনেকেই এখন অন্ধের হাতি দেখার মতো কথা বলেন। আওয়ামী লীগের যারা বিরোধী তারা রাজাকার হয়ে যান। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলকেও তারা রাজাকার বলেছেন। বস্তুত রাজাকার বা আল বদর ছিল পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক রিক্রুট করা আনসার ভিডিপির মতো বেসামরিক একটি ফোর্স। মাসিক চুরানব্বই টাকা বেতনে এদের নিয়োগ করা হয়েছিল এবং এরা থানার নিয়ন্ত্রনে ছিল। পুল, কালভার্ট ও সরকারি স্থাপনা পাহারা দেয়াই ছিল এদের মুখ্য কাজ। দল-মত নির্বিশেষে গ্রামের অনেক বেকার যুবক এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ-ছাত্র লীগ সমর্থক ব্যক্তিও ছিল। রাজাকাররা সবাই যে 'দালালী' করেনি তার প্রমাণ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্র। এতে তারা পূর্ব পাকিস্তান সংকট বিশেষ করে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করার জন্য পুলিশ ইপিআর, আনসার, সেনাবাহিনীর একটা অংশ ও আওয়ামী লীগের সাথে আর্মড রাজাকারদেরও দায়ী করেছেন।

মুক্তিবাহিনী ধরে ধরে যাদের হত্যা করেছিল তাদের মধ্যে তৎকালীন জামায়াত এবং তার ছাত্র সংগঠনের

www.pathagar.com

সাথে সংশ্লিষ্ট লোক যেমন ছিল তেমনি ছিল মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামে ইসলাম, ওলামায়ে ইসলামসহ অন্যান্য দলের কর্মী সমর্থক মসজিদের ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক টুপিওয়ালা মুসল্লি প্রমুখও। এদের বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি। নোয়াখালির কোম্পানিগঞ্জ, রামগতি, লক্ষীপুর, রামগঞ্জ, ফেনীর বাজাঝির দিঘিরপার, ক্রোশ মুনশীর হাট সহ সারাদেশের এই গণহত্যার শিকার ব্যক্তিদের গণ কবরের সাক্ষীরা এখনো জীবিত আছেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে সাধারণ ক্ষমায় ছাড়া পাওয়া ব্যক্তিরা ছাড়া স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের মামলাও সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে আগাতে পারেনি। কেউ কেউ বলে থাকেন যে ৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, কথাটি ঠিক নয়। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র সচিব হিসেবে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে যারা জীবিত তাদের বেশ কয়েকজনের সাথেই আমার আলোচনা হয়েছে এবং সাবেক একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। মামলাগুলোর রেকর্ডপত্র এবং নথি বিভিন্ন থানা ছাড়াও আদালতের রেকর্ড রুম এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিশ্চয়ই আছে। এর ৯৯ ভাগ মামলায় অভিযোগের অনুকূলে তথ্য প্রমাণ এবং সাক্ষ্যই পাওয়া যায়নি। ফলে রিভিউ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই মামলাগুলো মীমাংসার অনুকূলে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। যে মামলাগুলোর বিচার হয়েছে সেগুলোরও বেশিরভাগ আপিলে গিয়ে টিকেনি।

এখানে আমি একটা প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। কিছু কিছু পত্রপত্রিকা এবং গণমাধ্যমকে জামায়াত বিরোধিতায় নির্লজ্জতার মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেখা যায়। এই নির্জলা মিথ্যাচারের একটা অংশ হিসেবে গত ৬ নবেম্বর ভোরের কাগজ পত্রিকায় শহীদুল্লাহ কায়সারের হাইজ্যাকার ও ঘাতক হিসেবে তৎকালীন ঢাকা মহানগরী জামায়াতের অফিস সেক্রেটারী জনাব আবদুল খালেক মজুমদারকে দায়ী করে একটি বিদ্বেষমূলক রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, জনাব মজুমদার শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারকে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জামায়াতের সদস্য এবং আলবদর বাহিনীরও সদস্য ছিলেন। জনাব কায়সারের স্ত্রী তাকে সনাক্ত করেছিলেন। আদালত তাকে ১০ বছর কারাদণ্ড ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তিনি ছাড়া পেয়ে যান। আরও কয়েকটি পত্রিকাও ইত:পূর্বে এই রিপোর্টটি ছেপেছে এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

এই রিপোর্টটি প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। জনাব খালেক মজুমদারকে শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণ ও হত্যার জন্য দায়ী করে মামলা হয়েছিল (১৯৭২ সালের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৮) মুক্তিবাহিনীর ৪/৫ জন সদস্য ২৩/১২/৭১ তারিখে তাকে গ্রেফতার করে এবং ২০/১২/৭১ তারিখে এফআইআর-এর ভিত্তিতে বিপিসি'র ৩৬৪ ধারায় তদন্ত করে পুলিশ তার বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনাল তাকে ৭ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে। সরকার পক্ষ এই শাস্তিকে বর্ধিত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য উচ্চ আদালতে আপিল করেন এবং জনাব মজুমদারের পক্ষ থেকেও অবিচারের অভিযোগে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আপিল করা হয়। উভয় আপিলের একসাথে শুনানি হয় এবং বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও বিচারপতি সিদ্দিক আহমদ চৌধুরীর যুক্ত বেঞ্চ বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা শেষে সরকারের আপিল প্রত্যাখ্যান এবং জনাব মজুমদারের আপিল গ্রহণ করে তাকে শাস্তি

www.pathagar.com

থেকে অব্যাহতি দেন। বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই এই শাস্তি মওকুফ হয়েছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে এর সম্পর্ক ছিল না। ১৯৭৬ সালের ২৯ এপ্রিল প্রদত্ত এই রায়ের ২৬ পৃষ্ঠায় সাক্ষ্যপ্রমাণের পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ, ২৭ ও ২৮ পৃষ্ঠায় রায়ের ভিত্তি হিসেবে ৮টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

"1. That mentioning of the name of Abdul Khaleq in the FIR on 20-12-71 was motivated, because till then nobody had soon Abdul Khaleq nor anybody has mentioned that Abdul Khaleq kidnapped. The only information was from PW4 that Khaleq made a querry.

2. Not a Single withness to whom allegedly PW 1 and 2 had stated that they recognized the face of one miscreant was examined.

3. Publication of Photograph of Abdul Khaleq on 23rd December 1971 has dominated, the mind and judgment of the withnesses and therefore deposing at a such later period in july 1972. They were obsessed within idea that this was the man who must have committed the murder.

4. Circumstances showing that Abdul Khaleq was a member of Jamat-e-Islami dominated the mind as judgment of the prosecution witnesses, because impression was created that Jamat-e-Islami was against the movement of liberation. Be that as it may, this impression was responsible for influencing the inductive reasoning of the witnesses.

5. Publication by the newspapers as to how he was arrested where he was arrested and what he stated and what he did not say had a cumulative effect which were reflected in the evidence of the prosecution witnesses.

6. The Trial court itself has found that there was no other overt act by Abdul Khaleq which would show that he acted as a culprit within the meaning of P.O.

এরপর মাননীয় আদালত তার পর্যবেক্ষণ ও রায়ে যা বলেছেন তা হচ্ছে:

1. None of the witnesses have proved that he was a member of Al Badr Bahini.

2. None of the members of the Mukti Bahini who apprehended the accused

www.pathagar.com

at Malibag was examined and therefore the evidence that PWs I and 2 had indentilied on the spot remains uncorroborated.

In the circumstances therefore the opinion is that doubt has crept into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give him benefit of doubt and the accused appellant is acquitted and it is directed that he be set at liberty if not wanted in any other connection.

এটা আদালতের রায়। এই রায়ে জনাব মজুমদার খালাস পেয়েছেন এবং জামায়াতের একজন নেতা হিসেবে তিনি যে আল বদরের সদস্য ছিলেন না তাও এতে প্রমাণিত হয়েছে।

জামায়াতের অন্য কোন নেতাও যে ফৌজদারি কোনও অপরাধে জড়িত ছিল তা অদ্যাবধি প্রমাণিত হয়নি। তাহলে কেন এই বিদ্বেষ অভিযান? জামায়াত নীতি নৈতিকতা, ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলে এজন্য নয় কি? একাত্তরের ভূমিকার জন্য যারা এদেশে ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত, বাংলাদেশ হবার পর তারা এমন কোনও কাজ করেননি যা এদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা বলে গণ্য হতে পারে। তারা কখনো ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সংগেও জড়াননি। যারা নিজেদের স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি বলে জাহির করেন তাদের অনেকের আচরণই দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাও আছে। কিন্তু জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে নেই। ৭১ সালের ভূমিকার কারণে তখন যদি কেউ স্বাধীনতার বিরোধী বলে গণ্য হয়ে থাকেন পরবর্তীকালে তারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে শপথনামা স্বাক্ষর করে আইনানুগ নাগরিক হিসেবে বসবাস করছেন, কাজেই জনাব মুজাহিদ দেশে স্বাধীনতা বিরোধী কেউ নেই বলে যে মন্তব্য করেছেন তাকে অসত্য বলা যায় না। সত্যের বিরোধিতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের ৬ নবেম্বর, ২০০৭ এর মন্তব্য প্রতিবেদনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি এই বিস্তারিত আলোচনার পর আমাদের বন্ধুরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভাবাবেগকে উস্কিয়ে দিয়ে নতুন ফেৎনা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকবেন এবং রাজনীতিকে ভদ্রলোকের পেশায় উত্তরণে সহায়তা করবেন।

-দৈনিক সংগ্রাম, ৮ নভেম্বর, ২০০৭

লেখক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট

www.pathagar.com

ময়না তদন্ত এক-এগারো

।। মাহমুদুর রহমান ।।

প্রচারণা পর্ব

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কত অত্যাশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে । ৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এর সিপাহি-জনতার সফল অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণকারী দল বিএনপি মহাসচিবের পদটি গভীর রাতে দখল করে নিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ওই মহান সংগ্রামের বিরোধিতাকারীদের একজন। দেখা যাক ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে কি না। আজকে অবশ্য আমি ৭ নভেম্বরের বৃত্তান্ত লিখতে বসিনি। বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের ছত্রিশ বছরের উত্থান-পতনের ইতিহাসের একটি অতি উজ্জ্বল দিনে কলম ধরেছি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি নির্মোহ ও পক্ষপাতশূণ্য বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে। একটি বিষয় নিয়ে আমার চিন্তাভাবনা সচরাচর একটি কলামেই সমাপ্ত করার চেষ্টা করে থাকি এবং সে কারণেই কলামের দৈর্ঘ্য কখনো সখনো পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে থাকে। তবে এ লেখাটিতে নিরুপায় হয়েই ব্যতিক্রম ঘটাতে হচ্ছে। বিষয়ের ব্যাপকতার জন্যই এবার তিনটি পর্বের প্রয়োজন পড়বে এবং পর্ব তিনটিকে প্রচারণা, বাস্তবায়ন ও উত্তরণ নামে অভিহিত করেছি। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলাম। মনে পড়ে, অনেকটা দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ নিয়ে ওই দিনটিতে আমার সহপাঠীদের সাথে সারাদিন ধরে ঢাকা শহর চষে বেড়িয়েছিলাম। আমাদের সমকালীন পঞ্চাশের প্রজন্মকে আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান বিবেচনা করে থাকি। আমরা ভাষা আন্দোলন দেখার সুযোগ না পেলেও মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখেছি, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে দু'টি সফল গণঅভ্যুত্থান দেখেছি এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ৭ নভেম্বর দেখেছি। ২০০৭ সালে এসে এক-এগারোও দেখলাম। তবে এই দিবসটির প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য আমাদের অন্তত আরো দু'টি দশক অপেক্ষা করতে হবে। এখন আমরা দু-একজন যারা নানা রকম ঝুঁকি নিয়ে লেখালেখি করছি, তারা ভবিষ্যতে মূল্যায়নের সহায়তা করার জন্য দলিল রেখে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। প্রত্যাশা করি, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দলিলগুলো থেকে গ্রহণ ও বর্জন করে নির্মোহ ও আবেগশূন্যভাবে এক-এগারোর প্রকৃত মূল্যায়নে ব্রতী হবেন। ২০ বছর পরের সেই মূল্যায়নে এক-এগারো ৭ নভেম্বরের উজ্জলতা পাবে কি না, সেটি নির্ভর করবে আজকের সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বিচক্ষণতা, দেশপ্রেম এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠবে, কারা এই সংশ্লিষ্ট পক্ষ? আমার বিবেচনায় পক্ষগুলো হচ্ছে রাজনীতিবিদ, বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্থানীয় সহযোগী সুশীল (?) সমাজ, আমাদের সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশের জনগণ। উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, এক-এগারো প্রকল্পের সাথে জনগণের কোনো সরাসরি সম্পৃক্ততা না থাকলেও এক-এগারোজনিত জটিলতা উত্তরণে জনগণ প্রধান ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হলেই শুধু দেশের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড এই নিবন্ধে পক্ষপাতহীনভাবে দেখা ও বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমেই স্বীকার করে নেয়া প্রয়োজন,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ও সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা সাফল্যজনকভাবে স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন বলেই ২৭ মার্চ-দেশের জনগণ একজন বীর সেনানির কণ্ঠে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছে এবং দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে অসীম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজকে ঘটনাচক্রে ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ যখন রাজনীতিবিদদের নস্যাৎ করতে চান তখন সম্ভবত তারা ভুলে যান যে, এই রাজনীতিবিদরা জন্ম না নিলে তারা কোনা দিনই একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার কর্ণধার হতে পারতেন না। যা হোক, আমার আলোচনা মূলত নব্বই দশক এবং তৎপরবর্তী সময়কালের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করব। আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর আমাদের সংবিধান গ্রহণের দিন থেকে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ দুই বছর দুই মাস একুশ দিন ছাড়া আমরা বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা করেছি ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। মধ্যবর্তী ১৬ বছর কেটেছে একনায়কতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, ছদ্মবেশী সামরিকতন্ত্র এবং ভেজাল গণতন্ত্রের সমন্বয়ে। **বাংলাদেশের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সরকারের প্রধানদ্বয় সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরে বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি এবং আলাপচারিতায় বিগত তিনটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের ব্যাপক ও তীর্যক সমালোচনা করেছেন। বিশেষত জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তব্যে প্রকাশ্য সরকারপ্রধান রাজনীতিবিদদের সমালোচনাকালে সৌজন্য, শালীনতা ও সম্মান বিসর্জন দিয়েছেন বলেই দেশের যেকোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিকের কাছে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই বক্তৃতার খসড়া প্রস্তুতকারী ব্যক্তি যে একটি অতি গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ করেছেন, তা জোরের সাথেই বলা যেতে পারে।**

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর থেকে দেশের জনগণ ইসলামে বিশ্বাসী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী বৃহত্তর বাঙালি ঘরানা এই দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত থেকেছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক বিশ্লেষকসহ বোদ্ধা মহল নিশ্চিত ছিলেন যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ধর্মনিরক্ষেতাবাদীরা নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করবে। অতিমাত্রায় আস্থাশীল শেখ হাসিনা পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা দিয়ে এসেছিলেন যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনে দশটি আসনের বেশি পাবে না। নির্বাচনের ফল কী হয়েছিল, তা দেশবাসী অবগত আছেন। বাংলাদেশে দু'টি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী রাজনৈতিক ধারার সহাবস্থানের বিষয়টিকে দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল ইতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখেছিল। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে অধিকাংশই আশা পোষণ করেছিল, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে যেমন দু'টি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দল থাকার কারণে সেখানে গণতন্ত্রের ভিত শক্তিশালী হয়েছে ঠিক একইভাবে আমাদের দেশেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হবে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ঘরানার শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বে পারস্পরিক সৌজন্য এবং শ্রদ্ধাবোধের অভাবের কারণে রাজনীতি প্রথম থেকেই সঙ্ঘাতমুখর হয়ে ওঠে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত না হলেও ২০০১ থেকে ২০০৬ দীর্ঘ পাঁচ বছর একটি রাজনৈতিক সরকারের অধীনে দায়িত্বশীল একাধিক পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে এই বিরাগের বিষয়টি কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ করেছি। একেবারে নিরপেক্ষ বিচারে আমার কাছে অন্তত প্রতীয়মান হয়েছে যে দেশের প্রধান দুই নেত্রীর এত তীব্র বৈরিতার জন্য আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা

www.pathagar.com

অধিকতর দায়ী। বেগম খালেদা জিয়া সর্বদাই অন্তত পক্ষে একটি কাজ চালানোর মতো সম্পর্ক তৈরিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু অন্য পক্ষের অতি শীতলতার কারণেই দুই নেত্রীর মধ্যে এই নূন্যতম সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে সাধারণ সৌজন্যবোধ নির্বাসনে যাওয়ার জন্য শেখ হাসিনা যে ব্যক্তিগতভাবে বহুলাংশে দায়ী, এটা সম্ভবত তার সমর্থকরাও স্বীকার করবেন। পরিতাপের বিষয় হলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান অরাজনৈতিক সরকারও আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর অসৌজন্যমূলক আচরণের ধারাবাহিকতা নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনাপুত্র জয়ের সস্ত্রীক দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তারেক জিয়া কর্তৃক ফুল, কার্ড ও মিষ্টি প্রেরণের ঘটনাটি স্মরণ করা যেতে পারে। এসব উপহার ফিরিয়ে দিয়ে শেখ হাসিনা এবং তার পরিবার রাজনীতির পরিবেশকে আরো অসুস্থ করে তুলেছিলেন। এ জাতীয় হীনম্মন্য কর্মকাণ্ডের ফলে আমাদের সংসদ প্রকৃত অর্থে কখনোই কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। তদুপরি বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে এক প্রকার স্বৈরতান্ত্রিক দল পরিচালন সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাটি উদ্ধৃত করছিঃ

'অনুচ্ছেদ ৭০ ঃ পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূণ্য হওয়া-১) কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদের উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাহার আসন শূণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা 'যদি কোনো সংসদ সদস্য, যে দল তাহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন অথবা সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

ধারণা করা যেতে পারে, সংবিধান প্রণেতারা বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে অনৈতিক সংসদ সদস্য বেচাকেনা বন্ধ করার সদুদ্দেশ্যেই সংবিধনে উপরোক্ত ধারাটি সংযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই এখন এ ধারণা পোষণ করেন যে, অনুচ্ছেদ ৭০-এর অপব্যবহারের কারণেই বাংলাদেশে গণতন্ত্র অদ্যাবধি সংহত করা সম্ভব হয়নি।

নব্বই দশকের রাজনীতিতে আরো একটি বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই দশকে রাজনীতির অঙ্গনে বিত্তশালী ব্যবসায়ী এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের পদচারণা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলগুলোয় অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, অন্যদিকে ঐতিহ্য অথবা প্রথাগত রাজনীতিবিদরা প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় নিজেদের বিপন্ন বোধ করতে থাকেন। বিত্তশালীরা রাজনীতিতে নবাগত বিধায় দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভের জন্য তারা নিজ নিজ সংসদীয় এলাকায় বিপুল অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। শুরু হয় অনিয়ন্ত্রিত টাকার খেলা। এমন পরিস্থিতিতে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। বড় বড় নেতা-নেত্রী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ক্রমেই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠতে থাকেন। উভয় প্রধান দলের শীর্ষ পর্যায় থেকেও ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির রাশ টেনে ধরার তেমন কোনো আন্তরিক চেষ্টা দেশবাসীর কাছে দৃশ্যমান হয়নি। বরং দুর্নীতি দমনের বিষয়ে নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায় থেকে

www.pathagar.com

অব্যাহতভাবে ভুল সঙ্কেত প্রদান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ দাবিটি অত্যন্ত জোরের সাথে সর্বদাই করে যাব যে, বাংলাদেশে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি যেখানে কাউকে শীর্ষ পর্যায় থেকে দুর্নীতি করতে বাধ্য করা হয়েছে। উচ্চপদে কর্মরত কোনো ব্যক্তি শতভাগ সততার সাথে রাষ্ট্র আর জনগণের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করতে চাইলে অন্তত বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শাসনামলে নিশ্চিতভাবে তিনি সেটা সহজেই করতে পেরেছেন। সেই সময় যারা দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন তারা নিজ আগ্রহেই এ জাতীয় দুষ্কর্মে ব্রতী হয়েছেন এবং এখন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। বিনিয়োগ বোর্ড এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপালনকালে আমি কোনো মহল থেকেই অন্যায় চাপের সম্মুখীন হইনি কিংবা আমার কঠোর দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণে কেউ বাধা সৃষ্টি করেনি।

তৃতীয় যে বিষয়টি নব্বই দশকের রাজনীতিকে কলুষিত করেছে তা হলো সন্ত্রাস। বাংলাদেশের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সর্বদাই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রেও তাদের শীর্ষ নেতৃত্ব সন্ত্রাস পরিহারের বদলে বরং দুর্ভাগ্যজনকভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে জোরদার করতে উৎসাহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় বিস্ময়করভাবে শেখ হাসিনা একটি লাশের বদলে দশটি লাশ ফেলে দেয়ার হুমকি প্রদান করেছিলেন। নিজ দলের রাজনৈতিক কর্মীদের সন্ত্রাসের মাত্রাকে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে ক্ষুব্ধ শেখ হাসিনা জানতে চেয়েছিলেন, আওয়ামী লীগের লোকজন হাতে চুড়িপরে অন্দরমহলে বসে থাকে কি না। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে রাজপথে তাণ্ডব সৃষ্টিতে তার আহ্বানকৃত লগি-বৈঠার 'অবদান' তো সর্বদাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে লজ্জাকর ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে।

উপরোক্ত ব্যর্থতাগুলোর দায়দায়িত্ব অবশ্যই রাজনৈকি নেতৃবৃন্দকে বহন করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা কি শুধু ক্রমাগতভাবে ব্যর্থই হয়েছেন?

১৯৯০ সালে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সফল গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে ২০০৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত তিনটি সরকারের সাফল্যের খাতা কি একেবারেই শূণ্য? দেশে-বিদেশে বর্তমান শাসকদের এবং তাদের সমর্থকদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারণায় বিশ্বাস স্থাপন করলে জনমনে এমন বিভ্রান্তি জাগাটাই স্বাভাবিক। তবে আশার কথা হচ্ছে, সত্য তার আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হবেই। প্রকৃত তথ্য হলো, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই ষোল বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের ঈর্ষনীয় অর্জন রয়েছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এই তথ্যটি সার্বক্ষণিকভাবে বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে বাংলাশের অর্জনের দিকে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক। অর্থনীতির উন্নয়নের চিত্রটি বোঝার জন্য ১৯৯২-৯৩ এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের মধ্যকার একটি তুলনীয় পরিসংখ্যান উদ্বৃত করা আবশ্যক।

(বিলিয়ন টাকায়)

	১৯৯২-৯৩	২০০৬-০৭
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	১২৫৩.৭০	৪৬৭৫.০০
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি	১৪৫৫.৭০	৩০৩২.১০
চলতি বাজার মূল্যে		

www.pathagar.com

মাথাপিছু জিডিপি (টাকা)	১০৯৯১.২০	৩৩২৫৩.০০
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৪.৬০%	৬.৫০%
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১১৪.৯০	১৪০.৬০
মোট বিনিয়োগ	২২৫.০০	১১৩৭.৩০
আমদানি	১৫৯.৩০	৬৯৫.৮০
রফতানি	৯২.৬০	৫৫০.৯০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	১০.৬০	৩৩.৪০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন ডলার)	২১২১.০০	৪৩৬০.০০

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা

সব বিচারেই রীতিমতো সন্তোষজনক পরিসংখ্যান। সমালোচকরা বলতে পারেন, দেশে দুর্নীতি না থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্রটি অধিকতর দর্শনীয় হতো। কিন্তু এ ধরনের সমালোচনা যে অন্তর্নিহিত চরম সত্যটি লুকাতে পারছে না তা হলো অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জাতি হিসেবে আমরা অনেক এগিয়েছি। অন্য এক দল সমালোচক হয়তো বলবেন, এই অগ্রগতির পেছনে রাজনীতিবিদদের কোনো অবদান নেই। এসবই ঘটেছে বাংলাদেশের মানুষের লড়াকু চরিত্রের কারণে। বিগত জোট সরকারের আমলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ যখন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন সুশীল (?) অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ঠিক এ জাতীয় একটি মন্তব্য করেছিলেন। আজ সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের পর নিশ্চিতভাবেই তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন নিশ্চয়ই দেশের যেকোনো উন্নয়নকেই তিনি তার সরকারের কীর্তি হিসেবে দাবি করবেন। আবারো সত্যি কথা হচ্ছে, দেশের উন্নয়নে সরকারের যে একটি অনুঘটকের ভূমিকা থাকে, সেটিকে অস্বীকার বা নস্যাৎ করার জো নেই।

বিগত ষোল বছরের পরিসংখ্যানে বিশ্বাস স্থাপন করলে যেকোনো যুক্তিবাদী মানুষকেই মানতে হবে আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি খাত ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে এবং বিএনপি সরকার বিনিয়োগ, শিল্প ও আর্থিক খাত যথেষ্ট কুশলতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পরিচালনা করেছে। সামাজিক খাতে উন্নয়ন ছাড়া শুধু অর্থনৈতিক খাতে প্রবৃদ্ধি দেশের সাধারণ জনগণের জন্য অর্থবহ হতে পারে না। কাজেই আর্থিক খাতের পাশাপাশি বাংলাদেশে সামাজিক খাতে উন্নয়নের চিত্রটিও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। মানবসম্পদ উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়াভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থানটি নির্ণয় করার জন্য নিচের সারণির সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

	দক্ষিণ এশিয়ার গড়	বাংলাদেশের অবস্থা
প্রাথমিক শিক্ষায় বালিকা ভর্তির হার (বালক ভর্তির শতকরা হিসেবে)	৭৯	১০০
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৬৬	৫১
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৫০৫	৪০০
শিশুর টিকা ব্যবহারের হার	৬৬	৮৩
নিরাদ পানির সুবিধা বঞ্চিত জনসংখ্যা	১৪.২০	৩.০০

www.pathagar.com

সূত্র ঃ Human Development in South Asia-২০০৩

দক্ষিণ এশিয়াভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম পোলিওমুক্ত হয়েছে, এই দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু ভর্তির হার সর্বোচ্চ, মাতৃ মৃত্যুর হার সর্বনিম্ন, শিশুদের টিকা প্রদানের হার সর্বোচ্চ, জিডিপি'র গড় হিসেবে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের হার সর্বোচ্চ (১৫.৫%) এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশই সর্বাপেক্ষা দ্রুততার সাথে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করতে পেরেছে। দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের স্থান সর্বাগ্রে। এ সব তথ্যই বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। তাহলে রাজনীতিবিদরা ৩৬ বছর ধরে শুধু মন্দ কাজই করে গেছেন, এমন ঢালাও অভিযোগের ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে কি?

রাজনীতিবিদদের প্রকৃত মূল্যায়ন যে তাদের সফলতা ও ব্যর্থতার সমন্বয়েই করতে হবে, এই পরম সত্যটি বর্তমান ক্ষমতাসীনরা হয় উৎসাহের আতিশয্যে নয়ত উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্বীকার করতে চাচ্ছেন না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এত নিম্নস্তরের মানসিকতা দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে শেষ বিচারের বিষয়েও বারবার ভালো ও মন্দ কাজের সঠিক পরিমাপের কথা বলেছেন। সূরা আল কারিয়াহ'র ৬, ৭, ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা পরিষ্কার বলেছেন, "অতএব, যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া।"

আজ ক্ষমতাবানরা রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডের একতরফা বিচারের চেষ্টা করে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন বলা যায়। এক-এগারোর ময়নাতদন্তে এবার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরাশক্তি ও তাদের স্থানীয় দোসরদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এক দশক ধরে এই গোষ্ঠী অব্যাহতভাবে অসত্য ও অর্ধসত্যের সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে গেছে। দুর্নীতি এবং ইসলামি মৌলবাদকে উপজীব্য করেই প্রধানত এই প্রচারণা চালানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছর সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর ২০০১ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামি চেতনায় বিশ্বাসী জোট বিপুল বিজয় লাভ করার পরই মূলত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের মাত্র তিন সপ্তাহ আগেই নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার কথিত ইসলামি সন্ত্রাসীগোষ্ঠী কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

ইহুদি ও খ্রিষ্টান নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে এক ধরনের ইসলামবিরোধী বিতৃষ্ণার (Islam Phobia) প্রবাহ চলমান অবস্থায় বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশে চারদলীয় জেটের বিপুল বিজয় যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মুরুব্বি রাষ্ট্রগুলোকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল, সেটি বলাই বাহুল্য। এদিকে একই সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গোষ্ঠী নির্বাচনে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সারাবিশ্বে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পিত কাহিনী ছড়িয়ে দেয়। বিদেশী শক্তির স্থানীয় অনুচর হিসেবে এই প্রচারণায় সক্রিয় অংশ নেয় সুশীল (?) সমাজভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো, সংবাদমাধ্যমের একটি বৃহৎ অংশ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে তো বটেই, এমনকি বাংলাদেশের চিহ্নিত সংবাদমাধ্যমেও দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশকেই অন্যায়ভাবে একটি সাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদী রাষ্ট্ররূপে প্রচার করার সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অথচ প্রায় একই

www.pathagar.com

সময় অর্থাৎ ২০০২ সালে ভারতের গুজরাট রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মৌন সম্মতিতে সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বর্বরতর গণহত্যা চালানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা এবং সুশীল (?) সমাজ টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করেনি। বাংলাদেশের তৎকালীন জোট সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলেই এ দেশে ভারতবিরোধী প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা গেছে এবং সংখ্যালঘুরা নিরাপদে থাকতে পেরেছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এই দায়িত্বশীলতার জন্যও বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ভাগ্যে কোনো রকম প্রশংসা জোটেনি। বাংলাদেশের ছত্রিশ বছরে যেখানে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সংঘটিত হয়নি, সেখানে ভারতের বিভিন্ন অংশে এই সময়ে শত শত দাঙ্গায় হাজার হাজার সংখ্যালঘু প্রাণ হারিয়েছে। তার পরও ভাগ্যের ফেরে আমরা 'মৌলবাদী' এবং আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী 'ধর্মনিরপেক্ষ'।

দুর্নীতির ক্ষেত্রেও প্রচারণা এবং বাস্তবের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষণীয় ছিল। অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে দু'টি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে, জোট সরকারের আমলে শুধু এই খাত থেকেই ২০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে যদিও পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে মোট বাজেটের পরিমাণই ছিল ১৩ হাজার কোটি টাকা। শুধু তা-ই নয়, বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত তদন্ত কমিটিও তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই মন্ত্রণালয়ে উল্লেখ করার মতো বড় মাপের কোনো দুর্নীতি আজ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি। অথচ এই মন্ত্রণালয়ের কথিত দুর্নীতির গল্প সুশীল (?) সমাজের মুখপাত্র প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার পত্রিকায় নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে। স্বয়ং সেনাপ্রধানও তার বক্তব্যে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করেছেন। সম্ভবত প্রচারণায় বিশ্বাস করে তিনিও অভিযোগ করার আগে সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেননি। বিগত সরকারের আমলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যও হাওয়া ভবন নিয়ন্ত্রিত কথিত সিন্ডিকেটকে দায়ী করে আওয়ামী ঘরানার এক অর্থনীতিবিদ সংবাদ মাধ্যমের সহায়তায় অবিরাম প্রচার চালিয়ে গেছেন যে, পাঁচ বছরে কৃত্রিম উপায়ে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়েই নাকি ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন করা হয়েছে। জোট সরকারের বিদায়ের পর বিগত এক বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মূল্যবৃদ্ধির হার পাঁচ বছরের মোট পণ্য মূল্যবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পরও সেই অর্থনীতিবিদরা এখন মূক এবং বধির। বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মূল্যবৃদ্ধি কাকে বলে। গণতন্ত্রের গাড়িটিকে লাইনচ্যুত করে এক-এগারোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যই আধিপত্যবাদী শক্তি এবং তাদেরই অর্থপুষ্ট স্থানীয় দালালরা আমাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে প্রচারণা যুদ্ধ চালিয়েছে, এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়ার আর কোনো সুযোগ আছে কি?

বাস্তবায়ন পর্ব

২০০১ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থীদের একতরফা বিজয় বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার পূজারী এবং তাদের বিদেশী প্রভূদের হতচকিত করে তোলে। আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমমনা দলগুলোর মধ্যে ১৯৯১ সালের মতোই নির্বাচন-পূর্ব অতি আত্মবিশ্বাসী সিনড্রোম ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৯১ সালে শেখ হাসিনা বিএনপিকে ১০টি

www.pathagar.com

আসনের উর্ধ্বে দিতে চাননি। ২০০১ সালে অবশ্য তার আশাবাদের পারদ অতটা উচ্চ না হলেও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন থিঙ্কট্যাঙ্ক তাকে কমপক্ষে ১৮০টি আসনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল। কিন্তু, নির্বাচনের ফলাফল পুনর্বার প্রমাণ করে দিলো যে, জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থীদের ঐক্য বজায় থাকলে বাংলাদেশে ধর্মনিপেক্ষতায় বিশ্বাসী গোষ্ঠীর জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে অক্টোবর নির্বাচনের আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়-এগারো ঘটে গেছে। হান্টিংটনের সভ্যতার সঙ্ঘাতের সাথে যুক্ত হয়েছে বুশ ডকট্রিনের চরম ইসলামবিরোধিতা। এই মেলবন্ধনের মূল লক্ষ যেখানে প্রতিটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পুরনো আদর্শ একেবারেই অচল। গণতন্ত্রের লেবাসে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির পছন্দসই সরকার প্রতিষ্ঠাই বুশ ডকট্রিনের মূল কৌশল। বিষয়টি নবরূপে পুরাতন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নয়।

গণতন্ত্রের লড়াইয়ে বাংলাদেশে পরাজিত শক্তিও বিষয়টি উপলব্ধি করে কৌশল পাল্টাতে কোনো রকম কালক্ষেপণ করেনি। আগের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নতুন সরকারগুলো অন্তত ছয়টি মাস মধুচন্দ্রিমায় কাটানোর সময় পেয়ে থাকে। কিন্তু, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিগত চারদলীয় জোট সরকার সংসদে তিন-চতুর্থাংশ আসন লাভ করার পরও সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই নানারকম চাপের মধ্যে পতিত হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনের ফল গ্রহণ-বর্জন নাটকের সাথে যুক্ত হয় চিহ্নিত গোষ্ঠী কর্তৃক কথিত সংখ্যালঘু নিপীড়নের অপপ্রচার।

নির্বাচনের পরদিন থেকেই ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রধান ব্যক্তি শাহরিয়ার কবির ও চলচ্চিত্র অভিনেতা হাসান ইমাম ব্যস্ত হয়ে পড়েন সীমান্তের এপার এবং ওপারে সংখ্যালঘুদের কাহিনী সংবলিত ক্যাসেট, সিডি প্রকাশনা ও প্রচারকাজে। সরকারের প্রথম বছরে নেতিবাচক প্রচারণা চলতে থাকে মূলত সংখ্যালঘু সমস্যা এবং ইসলামী মৌলবাদের কথিত উত্থানকে কেন্দ্র করেই। চারদলীয় জোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মাথায় ২০০২ সালের ৪ এপ্রিল বারটিল লিন্টনার নামে এক বাংলাদেশবিদ্বেষী সাংবাদিকের A Cocoon of Terror শিরোনমে লিখিত প্রতিবেদন নিয়ে 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ' তার প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করে। পুরো প্রতিবেদনটি সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা গালগল্প এবং বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারে পরিপূর্ণ ছিল। প্রতিবেদনটি কতখানি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং নগ্নভাবে বাংলাদেশবিরোধী ছিল সেটি বোঝার জন্য নিচের দু'টি উদ্ধৃতাংশই যথেষ্ট।

1. A revolution is taking place in Bangladesh that threatens trouble the region and beyond if left unchallenged. Islamic ›entalism, religious intolerance, militant Muslim groups with ›nternational terrorist groups, a powerful military with ties ›nts, the mushrooming of Islamic schools churning out ›ts, middle-class apathy, poverty and lawlessness.. all transform the nation.

www.pathagar.com

(বাংলাদেশে এমন একটি বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে যা নিবৃত করতে না পারলে ওই অঞ্চল এবং বহির্বিশ্বের জন্য সমস্যা তৈরি করবে। ইসলামি মৌলবাদ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের সাথে জড়িত বিদ্রোহী মুসলিম গোষ্ঠী, বিদ্রোহীদের সাথে জড়িত শক্তিশালী সেনাবাহিনী, ব্যাঙের ছাতার মতো দ্রুত বিকাশমান ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জঙ্গি ছাত্ররা, উদাসীন মধ্যবিত্ত সমাজ, দারিদ্র্য এবং অরাজকতা মিলে জাতির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।)

2. In the immediate term, Bangladesh's secular tradition is most at risk from the rise in fundamentalism. Attacks on Hindus, who generally support the staunchly secular Awami League, are increasing. "The intimidation of the minorities, which had begun before the election, became worse afterwadrs", said The Society for Environment and Human Development, a local non-governmental organization, in a report on the October poll. An Amnesty International report concurred and indicated that members of the BNP-led coalition were responsible. But neighboring India and Burma- which both have Muslim minorities- are also at risk, while the Western world cannot afford to be complacent either, analysts say.

(মৌলবাদের উত্থানে স্বল্পমেয়াদে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ধর্মনিপেক্ষ আওয়ামী লীগের সাধারণ সমর্থক হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি স্থানীয় এনজিও The Society for Enviornment and Human Development *অক্টোবর নির্বাচনের ওপর তৈরি করা এক প্রতিবেদনে লিখেছে, 'নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘুদের প্রতি যে ভীতি প্রদর্শন শুরু হয়েছিল, সেটা পরবর্তীকালে আরো ভয়াবহ হয়েছে।' অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে এই অভিমতের সমর্থন রয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের সদস্যরা এই কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। বিশ্লেষকরা বলেছেন, সংখ্যালঘু মুসলমান অধ্যুষিত প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং পশ্চিমা বিশ্ব এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে না)*

উপরোক্ত প্রতিবেনটি প্রকাশের ক'দিন আগেই ভারতের গুজরটে সংখ্যালঘু মুসলমান গণহত্যার নৃশংস এবং হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গেছে। বিস্ময়করভাবে লিন্টনার সাহেব ভারতে মৌলবাদের কোনো উত্থান খুঁজে না পেয়ে সেটি তিনি পেয়েছিলেন প্রশংসনীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশে। 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ'-এর প্রতিবেনটি যে একটি ফরমায়েশি লেখা ছিল এবং এই লেখার পেছনে যে আমাদের দেশেরই একশ্রেণীর ব্যক্তির মদদ ও উসকানি কাজ করছে সেটি বুঝতে দেশবাসীর খুব একটি সমস্যা না হলেও, বাংলাদেশবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রচারণায় যথেষ্ট কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। একই এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নবিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের উন্মোচিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রচারণা কৌশলে মৌলবাদের সাথে ব্যর্থ সংযুক্ত হয়।

www.pathagar.com

এমন বৈরী পরিস্থিতিতেও সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে অর্থনৈতিক অঙ্গন থেকে ক্রমেই ভালো সংবাদ আসতে আরম্ভ করেছিল । বিনিয়োগ, শিল্প, রফতানি, রাজস্ব আয়, প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সব ক্ষেত্রেই উন্নতি ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল। শত অর্ধসত্য এবং অসত্য প্রচারণা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে রোখা যাচ্ছিল না। মৌলবাদের অস্ত্রে বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে না পেরে দেশের অর্থনীতিকে আঘাত করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশের সুশীল (?) সংগঠনগুলো। রাজনীতি এবং প্রশাসনে দুর্নীতির বিস্তার তাদের এই রাষ্ট্রবিরোধী প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজটিকে সহজ করে দিয়েছিল। আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরাশক্তিদ্বয় তাদের স্থানীয় দোসরদের সমন্বয়ে দ্বিমুখী আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করে। একদিকে প্রচারণার জোরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাবৎ সাক্ষ্যপ্রমাণকে অস্বীকার করা এবং অন্যদিকে দুর্নীতির কাহিনীকে অতিরঞ্জিত করে দেশ-বিদেশে প্রচার করা। তৎকালীন সরকারের নীতিনির্ধারকরা নির্বাচনে বিপুল বিজয় লাভ করে অনাকাঙ্খিত আত্মপ্রসাদে ভোগার কারণে এ বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ প্রদান করতে অপূরণীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং দেশের একজন নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক পরিসংখ্যানকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের প্রতিবাদ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব বিবেচনা করে সুশীল সংগঠন সিপিডি'র বিভিন্ন প্রতিবেদনের ইচ্ছাকৃত তথ্যগত ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে শুরু করলাম। সিপিডি'র কর্তাব্যক্তিদের বিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়াল। বিশ্ব এবং আঞ্চলিক পরাশক্তিদ্বয়ের স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে আমাকে প্রকৃতপক্ষে একাকী লড়াই করতে হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তৎকালীন বিএনপি সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রী পর্যন্ত প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। অবশ্য এসব মন্ত্রীর মধ্যে অনেকের প্রকৃত রূপই এখন জনগণের কাছে ধরা পড়ে গেছে। সংবাদমাধ্যমের একটি বৃহৎ অংশ যে সুশীল (?) সমাজ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেটি সম্পর্কে দেশবাসী সম্যকভাবে অবহিত আছেন। সুশীল (?) সমাজভুক্ত সংবাদমাধ্যম মনে করল সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত । হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মহাভারতের মতো চক্রব্যূহ তৈরি করে অভিমন্যু বধ এবার সময়ের ব্যাপার মাত্র। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো মাহমুদুর রহমান নামক এক অস্পৃশ্য নমশূদ্র সিপিডি'র সব ব্রাহ্মণ সন্তানদের স্পর্শ করে মহাপাতকের কাজ করে ফেলেছে। দৃশ্যপটে এবার আবির্ভাব ঘটল বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিকদের। মার্কিন দূতাবাসের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা স্বয়ং বিনিয়োগ বোর্ডে উপস্থিত হয়ে আদালতে মামলা করার কারণে আমার বিরুদ্ধে সরাসরি সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপন করলেন। তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম আমি যাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছি তাদের মধ্যে চারজনই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং মাত্র একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। কাজেই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ ধোপে টেকে না। মুরব্বীদের তখনকার মানসিকতা বোঝানোর চেষ্টা হিসেবেই এই গল্পের অবতারণা করেছি। যা হোক, এই ঘটনার মাধ্যমে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, বাংলাদেশের সুশীল (?) সমাজের খুঁটি কোথায় এবং সেটি কতখানি শক্ত।

আমাদের দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের অতি স্পর্শকাতরতার বিষয়টি এ দেশের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা গেছে। বিগত জোট সরকারের পাঁচ বছরে যখনই মর্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো কর্মকর্তা বাংলাদেশে এসেছে তখনই আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান উপাসনালয়ে গমন তার সফরসূচিতে অবধারিতভাবে

www.pathagar.com

সংযুক্ত করা হয়েছে। আমাদের জন্য অধিকতর অবমাননার বিষয় হলো, এসব সফরসূচি তৈরিতে বাংলদেশ সরকারের আপত্তি-অনাপত্তিকে মূল্য দেয়ার কোনো চেষ্টা কখনো পরিলক্ষিত হতো না। কাকতালীয়ভাবে বর্তমান অস্বাভাবিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আপাতদৃষ্টিতে মার্কিন প্রশাসনের বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ কমতে শুরু করেছে। সে দেশের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী জন গ্যাস্টরাইট সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরকালে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপসনালয়ে গেছেন এমন ঘটনা স্মরণে আসছে না। এখন প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সংখ্যালঘুদের প্রতি মার্কিন প্রশাসনের জনসাধারণ্যে সহমর্মিতা প্রদর্শন তৎকালীন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কৌশলেরই অংশ ছিল।

২০০৬ সলের প্রথমার্ধে থেকেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি দ্রুত অবনতিশীল হতে আরম্ভ করে এবং এক অর্থে দেশবাসী শেষ খেলা (End game) প্রত্যক্ষ করতে থাকে। রাজনীতিবিদরা যথেষ্ট বিতর্কিত হওয়ার পর দক্ষ শিকারির মতো সুশীল (?) সমাজ এবার চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মার্চের ২০ তারিখে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ঢাকার পাঁচতারা শেরাটন হোটেলে জন্ম নেয় নাগরিক কমিটি। সুশীল (?) সমাজের মুখপাত্র এবং ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামবিরোধী পত্রিকাদ্বয় প্রথম আলো ও দি ডেইলি স্টার এবং সিপিডি'র সহযোগিতায় শেরাটন হোটেলে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিস্ময়করভাবে ওই বৈঠকে তৎকালীন সরকারের আইনমন্ত্রী এবং বর্তমানে কারারুদ্ধ ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ শুধু যে অংশগ্রহণ করেন তাই নয়, তিনি সুশীল (?) সমাজের আন্দোলনের সাথে সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করেন। দি ডেইলি স্টার পত্রিকার ওয়েব এডিশনে (Web Edition vol.5 num 644) জনাব মওদুদ আহমদের নিম্নোক্ত বক্তব্য এখনো সম্ভবত পাওয়া যাবেঃ

Moudud Ahmed participated in the open discussion at the dialogue, and expressed solidarity with the proposed civil society movement to force political parties to nominate honest and competent people as candidates in the election. "Please launch the movement so vigorously that we the politicians are compelled to follow your suggestions for putting honest people in the electoral race", the minister said.

(মওদুদ আহমদ মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানে বাধ্য করার সুশীল সমাজের প্রস্তাবিত আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। 'আপনারা এমন সক্রিয় আন্দোলন পরিচালনা করুন যাতে আমরা রাজনীতিবিদরা আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী সৎ এবং যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচনে মনোনীত করতে বাধ্য হই' মন্ত্রী বলেন)।

দিনব্যাপী আলোচনা শেষে প্রফেসর রেহমান সোবহান এবং ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে যথাক্রমে কনভেনর এবং সদস্যসচিব মনোনীত করে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট নাগরিক কমিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। সেই সাথে সিপিডি'র প্রতিষ্ঠাকালীন ট্রাস্ট ডিডের শর্ত ভঙ্গ

www.pathagar.com

করে ওই প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়কে এই আন্দোলনের সচিবালয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংবিধান অনুযায়ী সরকারের বিদায় গ্রহণের তখন আর মাত্র সাত মাস বাকি থাকায় প্রশাসনে ক্ষমতাসীন সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষয়িষ্ণুমান। তদুপরি নানারকম দুর্নীতির অভিযোগে নীতিনির্ধারকদের নৈতিক অবস্থানও যথেষ্ট দুর্বল। ঐতিহ্যগতভাবে সিদ্ধান্তহীনতার জন্য বিখ্যাত বিএনপি নেতৃত্ব তাদের 'দেখা যাক কী হয়' নীতি অব্যাহত রেখেই দেশ চালিয়ে যেতে থাকল। পরিনামে 'যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন' গোষ্ঠী বিদেশীদের সক্রিয় সমর্থনে শহরে শহরে প্রচার চালিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে রাজনীতিকবিরোধী একটি মনোভাব গড়ে তুলতে সমর্থ হলো।

শেরাটন হোটেলে উদ্দেশ্যপূর্ণ গোলটেবিলের ঠিক দুই মাসের মাথায় মে মাসের ২০ তারিখে ঢাকার পাশের জেলা গাজীপুরের শ্রীপুরে বাংলাদেশে প্রধান রফতানি পণ্য পোশাক শিল্পে নজির বিহীন শ্রমিক বিদ্রোহের সূচনা ঘটল। এফএস সোয়েটার নামক একটি কারখানায় এই আন্দোলন শুরু হয়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র শিল্প খাতে। ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার প্রায় ৪ হাজার কারখানায় আকস্মিক ধর্মঘটে উৎপাদন ব্যাহত হলো। বহিরাগত নেতাদের উসকানিতে উত্তেজিত শ্রমিকরা ১৬ টি কারখানায় অগ্নিসংযোগ করে এবং কয়েকশ' কারখানায় ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিভিন্ন কারখানায় নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন শ্রমিক নিহত হয় এবং সহস্রাধিক আহত হয়। চারদলীয় জোট সরকার প্রথম কয়েকদিন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও পরে শৃঙ্খলা ফেরাতে বিডিআর এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করা সহিংস আন্দোলন চলাকালীন অনেক অভিজ্ঞ বিশ্লেষকই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, এর নেতিবাচক প্রভাবে বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্প খাতটি দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমান অর্থবছরে প্রথম তিন মাসে আমাদের তৈরী পোশাক রফতানিতে যে ধস নেমেছে তার পেছনে একাধিক কারণের মধ্যে ২০০৬ সালের দুর্ভাগ্যজনক শ্রমিক আন্দোলন অন্যতম। এই আন্দোলনের প্রকৃত কারণ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও **একটি বিষয়ে সব পক্ষই একমত পোষণ করে থাকেন যে, আন্দোলকে চরম হঠকারিতার দিকে ঠেলে দেয়ার পেছনে বাংলাদেশের উন্নয়নবিরোধী দেশী এবং বিদেশী পক্ষ জড়িত ছিল**। দেশের অর্থনীতি এখন যে ভয়াবহ মন্দায় পতিত হয়েছে সেখান থেকে উদ্ধার পেতে হলে রফতানি বৃদ্ধি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো পথ বাংলাদেশের সামনে খোলা নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্ষমতা গ্রহণের পর বর্তমান সরকার রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে অবহেলা করার ফলে পরিস্থিতি জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। **বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে অপপ্রচার পরিচালনাকারী গোষ্ঠী এবং শিল্পকারখানা ধ্বংসকারী অপশক্তির মাধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়া আর কারো পক্ষে নিশ্চিতভাবে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় এই যোগসূত্র না থাকাটাই বরং অস্বাভাবিক**। বিভিন্ন মহলের অর্থনীতিবিধ্বংসী নানাবিধ কার্যকলাপের মোকাবেলায় ক্ষমতাসীন বিএনপি'র গণমুখী রাজনীতি করতে চরম ব্যর্থতায় দেশের পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

সেই কলঙ্কময় দিনে তৎকালীন সরকারের সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদে যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন তারাই

www.pathagar.com

আজ দেশ পরিচালনা করছেন। কেউ কেউ আরো উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং অধিকতর ক্ষমতাবান হয়েছেন। আমার বিবেচনায় তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা এই মর্মান্তিক ঘটনার সত্য উদঘাটনের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, বর্তমান সরকারের এমন কোনো প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত জন গণের কাছে দৃশ্যমান হয়নি। সংবাদপত্রে পড়ছি যে, ভিডিও ফুটেজ দেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের সময় সেনাবাহিনীর গাড়িতে অগ্নিসংযোগকারীদের খুঁজে বের করা হচ্ছে। একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের দুস্কৃতকারীদের কেন খুঁজে বের করা হচ্ছে না সেটি বোধ্যগম্য নয়।

যা হোক, পরবর্তী দুই মাস ১৪ দিন বাংলাদেশে অত্যন্ত অরাজক এবং ঘটনাবহুল সময় কেটেছে। নতুন নতুন উপদেষ্টা এসেছেন এবং গেছেন। সদাব্যস্ত বিদেশী কূটনীতিককুল প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন। দেশের সর্বত্র অরাজকতা আরো বিস্তৃত হয়ে সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। আমাদের সেনাবাহিনী নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ দূতাবাসের চাপে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর এমন প্রকাশ্য এবং সরাসরি আঘাত আগে কখনো দেখেছি কিনা স্মরণে পড়ছে না।

এলো ১০ জানুয়ারি ২০০৭। জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের মুখপাত্র বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে নিউইয়র্কে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করলেন।

"The political crisis in Bangladesh has severely jeopardized the legitimacy of the electoral process. The announced cancellation of numerous international observation missions is regrettable. The united Nations has had to suspend all technical support to the election process, including by closing its international coordition official for Election observers in Dhaka. The United Nations is deeply concerned by the deteriorating situation in the country, and urges all parties to refrain from the use of violence. It is hoped that the Army will continue to play a neutral role, and that those responsible for enforcing the law act with restraint and respect for human rights. The United Nations urges the non-party Caretaker Government and Election Commission to create a level playing field and ensure parties can have confidence in the electoral process. The United Nations is concerned that Bangladesh's democratic advances and international standing will be negatively affected if the current crisis continues. It urges all concerned to seek a compromise that will serve the interests of peace, democracy and the country's overall well-being."

www.pathagar.com

(বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কট নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাকে চরমভাবে বিপন্ন করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বাতিলের ঘোষণা দুঃখজনক। জাতিসঙ্ঘকেও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলগুলোর সহায়তার জন্য গঠিত ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সমন্বয় কার্যালয় বন্ধসহ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সব প্রযুক্তিগত সহায়তা স্থগিত করতে হয়েছে। জাতিসঙ্ঘ দেশটির ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতিতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং সব পক্ষকে সহিংসতা পরিহার করার জন্য আহবান জানাচ্ছে। আশা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, সেনাবাহিনী তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন তারা ধৈর্য এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। জাতিসঙ্ঘ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যেন তারা সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করেন যাতে সব দল নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থাশীল হতে পারে। জাতিসঙ্ঘ উদ্বিগ্ন যে, বর্তমান সমস্যা দীর্ঘায়িত হলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থান নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। এই সংস্থা পক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছে যাতে তারা এমন একটি আপস-মীমাংসায় উপনীত হতে পারে যা দেশটির শান্তি, গণতন্ত্র এবং সার্বিক মঙ্গল বিধান করবে)

পরদিন ঢাকায় ইউএনডিপি'র স্থানীয় প্রতিনিধি জাতিসঙ্ঘ মহাসচিবের বরাতে যে বিবৃতিটি প্রদান করেন সেখানে জাতিসঙ্ঘ সদর দফতরের মূল বিবৃতির সাথে বিস্ময়করভাবে নিম্নোক্ত অংশটি জুড়ে দেয়া হয়।

"Deployment of the Armed Forces in support of the election process raises questions. This may have implications for Bangladesh's future role in UN Peacekeeping Operations."

(নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীকে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হবে)

ইউএনডিপি'র ঢাকাস্থ প্রতিনিধির উপরোল্লিখিত অতিউৎসাহের রহস্যের কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি। বর্তমান বছরের ৩০ মে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কারে কয়' শিরোনামে লিখিত কলামে এই অসঙ্গতির বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যার জন্য আজো অপেক্ষা করে আছি। অপেক্ষার পালা কোনো দিন ফুরাবে কি না তা অবশ্য জানি না। ইউএনডিপি'র বিবৃতি প্রকাশের দিনেই বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয় যা দীর্ঘ দশ মাস পরও বলবৎ রয়েছে। সমালোচকরা অভিযোগ করে থাকেন, ইউএনডিপি ঢাকা অফিসের বিতর্কিত বিবৃতিটি জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। জানুয়ারি মাসের ১০ এবং ১১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার রাষ্ট্রদূত ও ইউএনডিপি'র বাংলাদেশ প্রতিনিধির প্রকাশ্য কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে সন্দেহটি অধিকতর ঘনীভূত হয়। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত অবশ্য বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেকে আড়ালে রাখতে সমর্থ হন।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বিভিন্ন ফোরামে মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ব্যাহত করার জন্য জাতিসঙ্ঘকে ব্যবহার করার এই উদাহরণ মোটেও সংস্থাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি। অবশ্য ইরাক এবং আপগানিস্তানসহ অন্যান্য ইসলামিক রাষ্ট্রে খ্রিষ্টান ও ইহুদি

www.pathagar.com

চরমপন্থী গোষ্ঠীর মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে সাক্ষীগোপালের মতো সিলমোহর প্রদান করার পর জাতিসঙ্ঘের মর্যাদা অথবা গ্রহণযোগ্যতা আর অবশিষ্ট রয়েছে কি না সে বিষয়েই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। যা হোক আগ্রাসী অপশক্তির দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশে এক-এগারো বাস্তবায়ন তো হয়েছে। এক-এগারো বাস্তবায়নে জনগণের কোনো ভূমিকা না থাকলেও দেশ বাঁচানোর স্বার্থে তাদের সম্পৃক্ত করেই বর্তমান সঙ্কট থেকে উত্তরণের উপায় অন্বেষণ করতে হবে। অন্যথায় আমাদের দ্রুত অপসৃয়মান সার্বভৌমত্ব একেবারেই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে।

উত্তরন পর্ব

এক-এগারোর কথিত রাজনৈতিক ভূমিকম্পের পর ১১ মাস চলছে। সেনাবাহিনী সমর্থিত অস্বাভাবিক সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি আগতপ্রায়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার এ দেশে পাঁচ বছরের মেয়াদে ক্ষমতাসীন হয়। সেই হিসাবে বলতে হবে, বর্তমান অগণতান্ত্রিক সরকার বেশ দীর্ঘ সময় ধরেই ক্ষমতায় আছে। জনগণ এবার তাদের সালাতামামি জানাতে চাইলে খুব বড় অপরাধ বোধহয় করে ফেলবে না। তাবৎ ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমার লেখালেখির উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি ঘনায়মান বিপদ সম্পর্কে দেশবাসীকে জাগরিত করে তোলা। স্বাধীন মোড়লের মতো তাদের পক্ষ থেকে ময়নাতদন্তের শেষ পর্বে আজ সরকারের খতিয়ান দেখার চেষ্টা করব। এমন প্রতিকূল অবস্থায় সরকারের সাফল্য দিয়ে লেখাটা শুরু করলে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থেকে হয়তো কিছুটা মুক্ত থাকতেও পারি। সাফল্যের তালিকায় রয়েছে মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন পুণর্গঠন এবং কঠোর ও ক্ষেত্রবিশেষে অমানবিক পন্থায় দুর্নীতিবিরোধী অভিযান। শেষোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আশা করছি রাজনীতিবিদরা ভবিষ্যতে অনিয়ন্ত্রিত দুর্নীতিতে লিপ্ত হতে দ্বিতীয়বার চিন্তাভাবনা করবেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থতার তালিকাটি তুলনামূলক যথেষ্ট দীর্ঘতর। অর্থনীতিতে চরম মন্দা প্রায় জোর করেই ডেকে আনা, মালয়েশিয়ায় শ্রমের বাজার হারানো, চাপিয়ে দেয়া সংস্কার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে একটি ধারার রাজনীতিকে প্রায় দেশ ছাড়া করা, নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে সংশয়াচ্ছন্ন করে ফেলা, মধ্যপ্রাচ্যের ভ্রাতৃপ্রতিম ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে দৃশ্যত দূরত্ব সৃষ্টি, সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদানে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ, বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় সেনাবাহিনীকে মাত্রাতিরিক্ত জড়িত করে ভবিষ্যতের জন্য সমস্যা তৈরি করা এবং অনেক ক্ষেত্রে দেশের সংবিধানবহির্ভূতভাবে দেশ পরিচালনার প্রবণতা বর্তমান সরকারের ব্যর্থতাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

সব সরকারই সাফল্য এবং ব্যর্থতার সংমিশ্রণেই দেশ পরিচালনা করে। যে সরকারের শাসনামলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান অধিকতর উন্নত হয় সেই সরকারকেই তুলনামূলক সফল আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জনগণের বিচারবুদ্ধি যথেষ্ঠ প্রখর বিধায় জীবনযাত্রার মানের আলোকে ড.ফখরুদ্দীন আহমদ পরিচালিত সরকারের মূল্যায়নের ভার তাদের ওপর ন্যস্ত করাই শ্রেয়। তবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এটুকু

www.pathagar.com

বলতে পারি, শুধু বাগাড়ম্বর (Rhetoric) দিয়ে সরকার কেন, কোনো প্রশাসনই চালানো যায় না।

ক্ষমতাসীনরা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। শান্তিপূর্ণ প্রস্থানের নিমিত্ত তার আগে দেশে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য, পক্ষপাতহীন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন একটি রোডম্যাপও জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেছে। রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো পক্ষ দ্বারা কোনো প্রকার জটিলতা সৃষ্টি বাঞ্ছনীয় ছিল না। কিন্তু কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশনের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবিমৃশ্যকারী কার্যকলাপের ফলে ইতোমধ্যেই শুধু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা-ই নয়, সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েই জনমনে নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বঘোষিত লাইসেন্সধারী কয়েকটি দল নির্বাচন কমিশনের কাছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে দাবি উত্থাপন করেছে তাতে নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের না থাকারই কথা। এই দাবি মেটাতে পারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সমর্থিত বর্তমান সরকার। এ বছর মার্চ মাসের ২৭ তারিখ মুক্তিযোদ্ধাদের এক সংবর্ধনা সভায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরের উপস্থিতিতে জাতির পিতা এবং যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত বক্তব্য প্রদানের পর থেকেই বহু বছর পর স্পর্শকাতর এসব বিষয় নিয়ে দেশে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে, স্বার্থান্বেষী মহল সব সময়ই বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ ইস্যুটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছে। ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ মদদে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির জন্ম হয় এবং তৎকালীন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য সেই সময় এই ঘাদানিক বেশ তৎপর ছিল। ১৯৯৫ সালে সবাইকে অবাক করে দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমমনা দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী কাছে অস্পৃশ্য জামায়াতে ইসলামীকে সাথে নিয়েই ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় আজকের কথিত যুদ্ধাপরাধীদের সাথে একসাথে বসে আলোচনা চালাতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কোনোই অসুবিধা হয়নি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিকারী নেতৃবৃন্দ পর্দার আড়ালে চলে গিয়ে পাঁচ বছরের জন্য একটা লম্বা ঘুম দেয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোট সরকার বিপুল বিজয় লাভ করার পরই শুধু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়। আবার শুরু হয় যুদ্ধাপরাধী রাজনৈতিক কার্ডের ব্যবহার। যা হোক গত ১০ মাসের কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে, ক্ষমতাসীন সরকার তথাকথিত উদারপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অধিকতর নমনীয়। বর্তমানের বন্ধুদের দাবি মেটাতে গেলে যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত করার জন্য সরকারকে প্রথমে একটি কমিশন গঠন করতে হবে। তারপর স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিযুক্তদের যুদ্ধাপরাধী প্রমাণ করে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার আইন প্রণয়ন করতে হবে। এরপরই কেবল নির্বাচন কমিশন চৌদ্দ দলের প্রথম দাবিটি পূরণ করতে পারবে। এই প্রক্রিয়াসম্পন্ন করতে পাঁচ দশ বছর লাগলে তত দিন ক্ষমতাসীনরাই দেশ পরিচালনা করবেন। এতে দেশের এমন আর কী ক্ষতি? সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সাধুসন্ত দেশ

www.pathagar.com

তো 'চমৎকার'ভাবেই চালাচ্ছে।

আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদলের সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে ভাষায় এবং ভঙ্গিতে আওয়ামী লীগের লগি-বৈঠা আন্দোলনের জন্য প্রায় জোড় হাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তাতে জনমনে এরকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, আওয়ামী লীগের যেকোনো দাবিই এখন ড. এ টি এম শামসুল হুদার কাছে শিরোধার্য। পরবর্তীকালে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় সরকার প্রধান অবশ্য বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটি তারা পূরণ করতে অপারগ। তবে সিদ্ধান্ত বদলাতেই বা কতক্ষণ? বিএনপি সরকার যেমন সিদ্ধান্তহীনতার জন্য সারাদেশে বিখ্যাত তেমনি বর্তমান সরকার ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য বিখ্যাত হয়ে থাকবেন বলেই আমার ধারণা।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করার দ্বিতীয় দাবিটি আরো চিত্তাকর্ষক। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় যে দল তাদের হেজাব পরা এবং মোনাজাতরত নেত্রীর পোস্টার দিয়ে সারাদেশ প্রায় আবৃত করে ফেলেছিল তাদের মুখেই আজ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের দাবি। অত অতীতে যাওয়ারই বা প্রয়োজন কী? গত বছর ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখে ধর্মনিরপেক্ষতার পূজারী আওয়ামী লীগ ধর্মভিত্তিক দল খেলাফত মজলিসের সাথে তিন দফা চুক্তি করেছে। দেখা যাক কী ছিল সেই তিন দফায়। ১. পবিত্র কুরআন সুন্নাহ ও শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না। ২. কওমি মাদ্রাসার সনদের সরকারি স্বীকৃতি যথাযথ বাস্তবায়ন করা হবে। ৩. নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে (ক) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী; (খ) সনদপ্রাপ্ত আলেমরা ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন। সনদবিহীন কোনো ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করতে পারবে না; (গ) নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করা দণ্ডনীয় অপরাধ। বিপরীত মেরুর দুই দলের মধ্যে এই ঐতিহাসিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ চুক্তিতে সই করেছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এবং খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী। উপরোক্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হলে কার্টুন সংক্রান্ত হঠকারিতার পর চরম ইসলামবিরোধী প্রথম আলো গোষ্ঠীর আজ কী অবস্থা হতো সেটি প্রাজ্ঞ পাঠকরাই ভেবে নিতে পারেন। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। যে জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করে সেখানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিধান এনেছেন তারই নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিও নাকি এখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন। এ জন্যই এসব ভণ্ডের বিষয়ে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরিফে মুমিনদের বারবার সাবধান করেছেন। কর্মী ও জনগণের সমর্থনবিহীন অথচ সংবাদ মাধ্যমের আনুকূল্যে ধন্য নেতাসর্বস্ব দলগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আমাদের কি এটাও বিশ্বাস করতে হবে, আওয়ামী লীগের মতো বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বোঝেন না যে, এই জাতীয় দাবি উত্থাপনের অর্থই হচ্ছে নির্বাচনকে অনিশ্চিত করে তোলা? এ কারণেই সম্ভবত একজন নির্বাচন কমিশনার ঈশান কোণে মেঘের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছেন। দুঃখের বিষয় হলো, নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ডে প্রতীয়মান হচ্ছে, ঈশান কোণের মেঘখণ্ডকে সরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তারা এটিকে অধিকতর ঘনীভূত করার সন্দেহজনক প্রক্রিয়ায় আদাজল খেয়ে লেগেছেন।

www.pathagar.com

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ-এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটি সব সরকারের আমলেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অক্টোবরের ২৯ তারিখ সকালে নির্বাচন কমিশনার হুহুল হোসাইন মন্তব্য করেছিলেন, ৭ নভেম্বর যেই ব্যক্তি বিএনপি'র মহাসচিবের দায়িত্বে থাকবেন তার কাছেই সংস্কারসংক্রান্ত আলোচনার জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করা হবে। ওই দিনই মধ্যরাতে জনাব সাইফুর রহমান তার বাসগৃহে কথিত দলীয় ক্যু ঘটালেন অথবা ঘটাতে বাধ্য হলেন। ব্যাপারটি বড় বেশি কাকতালীয় নয় কী? অবঃ মেজর হাফিজকে পত্র দেয়ার সপক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার দু'টি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে তার বিবেচনায় বিএনপি'র চেয়ারপারসন কর্তৃক জনাব মান্নান ভূঁইয়ার বহিষ্কারাদেশ অবৈধ, কারণ তাকে প্রকৃতি প্রদত্ত ন্যায়বিচার (Natural Justice) থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যদি আন্তরিকভাবে সে রকমই মনে করেন তাহলে নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণপত্রটি জনাব মান্নান ভূঁইয়ার কাছে কেন গেল না এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে। জনাব হুদার দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে, তথাকথিত 'অপরিহার্যতার মতবাদ' (Doctrine of Necessity)। জনাব সাইফুর রহমান এবং অবঃ মেজর হাফিজ তাদের রহস্যময় কর্মকাণ্ডকে জায়েজ করার প্রচেষ্টায় ঠিক এই যুক্তিটিকেই আগে ব্যবহার করেছিলেন। সব রকম অবৈধ কার্যকলাপ বৈধ করার জন্য এই অনৈতিক দর্শনের প্রয়োগ প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে কেবল বিতর্কিত এবং জনবিচ্ছিন্ন করে তুলতেই সাহায্য করবে। অথচ একই প্রধান নির্বাচন কমিশনার একাধিকবার ঘোষণা দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি দ্বারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হবে না। তারা নিরপেক্ষভাবে এবং দলীয় গঠনতন্ত্রের আলোকেই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বর্তমান নির্বাচন কমিশনের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে এবং তাদের পক্ষে ২০০৮ সালের ঘোষিত নির্বাচন অনুষ্ঠান বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে এবং সব মহলে গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে হলে আল্লাহর বিশেষ রহমতের প্রয়োজন হবে। নির্বাচন কমিশনের সাথে বিএনপি'র ২২ নভেম্বরের নির্ধারিত মতবিনিময় সম্বন্ধে হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের পর আমার ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টাসহ বর্তমান সরকারের অন্যান্য নীতিনির্ধারক ও স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন, দেশ নানারকম জটিলতা এবং সঙ্কটের আবর্তে রয়েছে। আমাদের ১৫ কোটি নাগরিকের বৃহত্তর স্বার্থে বর্তমান অবস্থা থেকে যত দ্রুত সম্ভব উত্তরণ আবশ্যক। অনির্বাচিত সরকার দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে শুধু যে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে তাই নয়, সময়ের সাথে সাথে যারা ক্ষমতায় থাকবেন তারাও বিতর্কিত হতে শুরু করবেন। বিতর্কিত হওয়ার বেশ কিছু আলামত ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে দু'টি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। প্রথম উদাহরণ সেনাবাহিনী প্রধানের ব্যাংক ঋণ সম্পর্কিত। গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় জেনারেল মইন উ আহমেদ ভয়েস অব আমেরিকায় এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ওই সাক্ষাৎকারে জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে সেনাবাহিনী প্রধান দাবি করেছেন, তিনি ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে গৃহনির্মাণ ঋণ হিসেবে ২৫ লাখ টাকা গ্রহণ করেছিলেন। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেছেন, ট্রাস্ট ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী গৃহনির্মাণ খাতে সর্বোচ্চ ঋণ প্রদানের সীমাই যেহেতু ২৫ লাখ টাকা কাজেই এই অংকের চেয়ে বেশি ঋণ নেয়ার কোনো সুযোগই নেই। কিছু দিন আগে ট্রাস্ট ব্যাংক পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত হয়েছে

www.pathagar.com

এবং তাদের শেয়ার বেশ উচ্চমূল্যেই বাজারে কেনাবেচা হচ্ছে। পদাধিকারবলে সেনাবাহিনী প্রধান ট্রাস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদেও অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রোসপেক্টাস জেনারেল মইন উ আহমেদ কোম্পানি আইনের স্বাভাবিক নিয়মে নিজেই সই করেছেন এবং উল্লিখিত প্রোসপেক্টাসে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৫ গৃহনির্মাণ খাতে জেনারেল মইন উ আহমেদের ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৯ লাখ ৬৯ হাজার ২১৫ টাকা মাত্র। একই প্রোসপেক্টাসের তথ্য অনুযায়ী ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর এই ঋণের পরিমাণ এক বছরে ৬৬ লাখ ৬৮ হাজার ৭০২ টাকা হ্রাস পেয়ে ৩৩ লাখ ১৫ হাজার ৩২৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে চলমান ঋণখেলাপির মন্দ সংস্কৃতিতে জে. মইন উ আহমেদ মাত্র এক বছরের মধ্যে বিপুল অঙ্কের ঋণ পরিশোধ করে প্রশংসনীয় কাজ করা সত্ত্বেও ব্যাপারটি নিয়ে অনভিপ্রেত বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আমি নিশ্চিত, বর্তমানে স্বাভাবিক কোনো সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে এই বিতর্কের সৃষ্টিই হতো না। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎকারে সেনাপ্রধানের বক্তব্য এবং প্রোসপেক্টাসে একই সেনাপ্রধান অনুমোদিত এবং সইকৃত তথ্যের মধ্যে যেহেতু হিসাবের একটি বড় গরমিল পরিলক্ষিত হচ্ছে কাজেই পুরো বিষয়টির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষার জন্যই সম্ভবত অতীব জরুরী।

দ্বিতীয় উদাহরণটি শিল্প উপদেষ্টা গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরীর স্বামী নাজিম কামরান চৌধুরীর বিরুদ্ধে গুলশানের একটি বাড়ি দখলের প্রচেষ্টার অভিযোগে মামলা দায়ের বিষয়ক। গুলশান-২ এর ৪১ নম্বর সড়কের ৭/এ, বাড়ির মালিক ড. মাহবুবুল ইসলামের স্ত্রী ফারহানা ইসলাম বাদি হয়ে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩২৪ এবং ৪৪৮ নম্বর ধারায় ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে ১৪ নবেম্বর ব্যবসায়ী নাজিম কামরান চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। মামলার ফল আদালতে কী হবে জানি না, তবে সরকারের ভাবমর্যাদার ক্ষতি যা হওয়ার সেটা সম্ভবত হয়েই গেছে। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, বর্তমান সরকারের মেয়াদ যতই দীর্ঘায়িত হবে ক্ষমতাসীনরা ততই অধিকতর অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন যা দেশের জন্য শুভ নয়। এ তো গেল ব্যক্তিগত বিষয় সংক্রান্ত বিতর্ক। দেশের জন্য অধিকতর বিপজ্জনক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে একটি মহল কর্তৃক ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিকে কেন্দ্র করে। আমার বিবেচনায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্ত্বার দুই শক্তিশালী ভিত্তি হচ্ছে ভাষা এবং ধর্ম। এই দেশটির ১৫ কোটি জনগোষ্ঠীর ৯৯ শতাংশ ব্যক্তির ভাষা যেহেতু বাংলা এবং ৯০ শতাংশ ব্যক্তির ধর্ম যেহেতু ইসলাম সে জন্যই আমরা আজ স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক। এই সমীকরণ থেকে ধর্মকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হলেই প্রতিবেশী ভারতের বাংলাভাষী প্রদেশের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়ার সুযোগ তৈরি হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতোমধ্যেই পাসপোর্ট-ভিসা তুলে দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করে বাংলাদেশের ভারতপ্রেমীদের কাছে পরম নমস্য হয়ে উঠেছেন। আমাদের দেশের যেসব রাজনৈতিক নেতা এবং চিহ্নিত বুদ্ধিজীবী মহল এই ধরনের দাবি উত্থাপন করছেন তাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার ১০ মাসের অধিক সময় ধরে সংস্কারের নামে রাজনৈতিক দলগুলোয় রকমারি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে। এর ফলে রাজনীতিতে অর্থবহ কিংবা ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন অদ্যাবধি সাধিত না হলেও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিঃসন্দেহে দুর্বল করা সম্ভব

www.pathagar.com

হয়েছে। নীতিনির্ধারকদের দাবি অনুযায়ী তারা নাকি দেশে সব রাজনৈতিক দলের জন্য কালো টাকা, সন্ত্রাসমুক্ত এবং সমান সুযোগবিশিষ্ট পরিবেশ তৈরি করতে দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন। বাস্তবতা হলো, এক-এগারো-পূর্ব চৌদ্দদলীয় জোটকে শুধু যে একতাবদ্ধ রাখা হয়েছে তাই নয় বরং আগামী নির্বাচনের আগে আমরা নিশ্চিতভাবেই অখণ্ড মহাজোটের পুনরুত্থান প্রত্যক্ষ করব। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী শক্তি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত থাকবে এবং নির্বাচনে একে অপরের বিরোধিতা করবে। সরকারি উদ্যোগে সংস্কারের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে এমন ধারণা পোষণ করা অমূলক হবে না যে, সাইফুর রহমানপন্থীরা ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন এবং খালেদা জিয়াপন্থীরা সেই নির্বাচন বর্জন করবেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা করে ইসলামি দলগুলোকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত রাখার কৌশল ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে কথিত নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য নিশ্চয়ই কোনো জ্যোতিষীর প্রয়োজন পড়বে না। দেশে এত দিন প্রায় সমশক্তির দু'টি রাজনৈতিক ধারা বিদ্যমান থাকায় এক প্রকার ভারসাম্যের মধ্য দিয়ে দেশ পরিচালিত হয়েছে। এখন একটি ধারাকে উৎখাত করা হলে দেশের স্বাধীনতাই যে বিপন্ন হয়ে পড়বে এই সহজ সমীকরণটি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সরকার অনুধাবন করছে কি না জানা নেই। এক-এগারোর কারিগরদের এমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি না তাও দেশবাসীর অজানা। যদি এই উদ্দেশ্যই থেকে থাকে তাহলে সফলভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাদের বাহবা দেয়া যেতে পারে। আর আদতে এমন কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে নীতিনির্ধারকদের জরুরি ভিত্তিতে তাদের কৌশল পুনর্মূল্যায়নের আহবান জানাব। জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থীদের উত্থান রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র মুসলিমবিশ্বে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এখন বদ্ধপরিকর। প্রকৃত গণতন্ত্র এবং নির্ভেজাল নির্বাচনের ফলাফল মুসলিম বিশ্বে অন্তত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যেতে পারে না তার জ্বলন্ত প্রমাণ তুরস্ক, ইরান, লেবানন, ফিলিস্তিন এবং সম্প্রতি মরক্কো। বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের অধীনে ফরমায়েশি নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বাগতই জানাবে। আমাদের আরো স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মার্কিন এবং ভারতস্বার্থ একযোগে কাজ করছে। আরো একটি প্রাচীন অথচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের অধ্যায় আমরা প্রায় বিস্মৃতই হয়েছি। পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলাহর পরাজয়ের পর থেকেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী খ্রিষ্টান শক্তির সাথে ভারতের বর্ণবাদী হিন্দুদের যে জোট গঠিত হয়েছে তা দিনে দিনে শক্তিশালী এবং দৃঢ় হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পরিচালিত হতে পারে না। মাত্র কিছু দিন আগে ভারতের একজন প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির ইসলামিক চরিত্র বিসর্জন দিয়ে এই দেশটিকে ধর্মনিরপেক্ষতার পোশাকে আবৃত করার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। আজকে চারদিকে চিহ্নিত দালালশ্রেণী ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যে ঐকতান ধরেছে তা যে ভারতের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই করা হচ্ছে সেটি জনগণের না বোঝার কোনো কারণ নেই।

আগেই বলেছি, বর্তমানে যারা প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে দেশ পরিচালনা করছেন তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনো আমাদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার না হলেও প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক বক্তব্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন বক্তব্যে তিনি দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

প্রথমটি হচ্ছে, তিনি এবং তার সরকার নাকি সৎ এবং যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেই ক্ষমতা থেকে বিদায় নেবেন। বাংলাদেশের সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানকে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার পছন্দ করার কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছে এজাতীয় কোনো ধারা তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব বেছে নেয়ার এই কঠিন দায়িত্ব ড. ফখরুদ্দীন আহমদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ স্কন্ধে তুলে নিতে চাচ্ছেন কেন? প্রধান উপদেষ্টার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, তিনি নাকি আর এক এগারোর আগে ফিরে যেতে চান না। সমস্যা হলো, এক-এগারোর আগের শেষ নির্বাচিত সরকারই যে তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে নিয়োগ দিয়েছিল এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ৬৫ বছর বয়স পার না হওয়া পর্যন্ত তিনি একটি কথিত দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের অধীনে বিনা প্রতিবাদে চাকরি করে গেছেন এই সত্য চেষ্টা করেও বিস্মৃত হওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এক-এগারো-পূর্ব বলতে প্রধান উপদেষ্টা যদি ২৮ অক্টোবর, ২০০৬ থেকে ১১ জানুয়ারি, ২০০৭ পর্যন্ত অরাজক সময়কাল বুঝিয়ে থাকেন তাহলে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশকে পরাশক্তি এবং আঞ্চলিক শক্তি মিলে যে একটি পরীক্ষাগারে পরিণত করেছে এ বিষয়ে অনেক ঝুঁকি নিয়ে গত ১০ মাস ধরে একাধিক কলামে বলার চেষ্টা করেছি। দেশের সার্বভৌমত্ব খণ্ডিত করে একটি বড় অংশকে ঢাকার গুলশান-বারিধারার বাংলাদেশের গ্রিন জোনে সংরক্ষণ করা হয়েছে। একটি অংশ আছে নিউইয়র্কের জাতিসঙ্ঘের সদর দফতরে। ক'দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম, বাংলাদেশের ভোটদাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম রিকশার পেছনে পোস্টার সেঁটে উদ্বোধন করছেন ঢাকাস্থ কানাডীয় হাইকমিশনার। আমাদের আত্মসম্মানবোধের আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। সার্বভৌমত্বের যে ক্ষুদ্র অংশটি এখনো আমাদের অধিকারে রয়েছে সেটিও দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ কত দিন পাহারা দিয়ে রাখতে পারবে তাও ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করবে। মনে রাখা প্রয়োজন, স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে সিকিমের ভারতভুক্তিও কিন্তু বিনা রক্তপাতে এবং সিকিমের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অথচ বিদেশী শক্তির কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া সংসদ সদস্যদের মাধ্যমেই ঘটানো হয়েছিল। বাড়ির পাশের এই অভিজ্ঞতা আগামী সংসদ নির্বাচন সম্পর্কেও আমাদের শঙ্কিত করে তুলছে।

বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল, দেশের ৪০ শতাংশ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন, জ্বালানি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ প্রক্রিয়া, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করে একটি ক্ষণস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দেশে বিভাজন সৃষ্টিকারী নানাবিধ বিষয় উত্থাপন করার ফলে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করে স্বাধীনতাকে সংহত করতে হলে দেশের জনগণকেই একতাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এই একতার জন্য আহবান জানানোর মতো প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সৎ এবং সাহসী রাজনৈতিক নেতৃত্ব বর্তমানে অনুপস্থিত। রাজনীতিবিদদের মুখোশে দুর্নীতিপরায়ণ দুর্বৃত্তদের সদম্ভ প্রত্যাবর্তনও দেশের মানুষের কাম্য হতে পারে না। এই বিশাল শূন্যতা পূরণে বিশ্ব ও আঞ্চলিক পরাশক্তিদ্বয়ের সাম্রাজ্যবাদী অভিলিপ্সাবিরোধী, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং ইসলামি চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, পেশাজীবী এবং পরিশীলিত রাজনীতিবিদসহ ন্যায়পরায়ণ সব চিন্তাশীল ব্যক্তির একতাবদ্ধ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, এই শ্রেণীভুক্তরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলে বাংলাদেশের আপামর সাহসী এবং দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী অবশ্যই আধিপত্যবাদী এবং

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের হুমকিও কি দেশের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নির্বাপিত করতে পেরেছিল? বর্তমানের এককেন্দ্রিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত জনতা মুক্তির সংগ্রাম তীব্রতর করছে এবং শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতেও শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার অনেক দেশের শোষিত জনগণই আজকের বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছে। আমরাই বা পিছিয়ে থাকব কেন? আপন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে রত, একতাবদ্ধ ১৫ কোটি মানুষের ঈমানের দৃঢ়তার সামনে মহাশক্তিধর আক্রমণকারীও পরাজিত হতে বাধ্য। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। বুকভরা বল নিয়ে মাথা উঁচু করে শত্রুর মোকাবেলা করার যে পন্থার কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতার মাধ্যমে বলেছেন সেটি উদ্ধৃত করেই শেষ করছি এক-এগারোর ময়নাতদন্তের সমাপনী পর্ব।

ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু-তোমা-চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার মনে মনে।'

দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৭, ১৪ ও ২১ নভেম্বর ২০০৭

লেখক ঃ সাবেক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা এবং বিনিয়োগ বোর্ডের সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তরালে

।। মাহমুদুর রহমান।।

দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশে সম্প্রতি ধর্মনিরপেক্ষতার একটা জোয়ার তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। যে গোষ্ঠীটি আমাদের সংবিধান থেকে মহান আল্লাহতায়ালার নাম সরিয়ে ফেলতে চায় তাদের কৌশলটি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে একটি 'ইসলাম বিতাড়ণ' কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা । কিন্তু ৯০ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী নাগরিক সংবলিত রাষ্ট্রে কাজটি সরাসরি সম্পন্ন করা যথেষ্ট বিপজ্জনক বিধায় মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টিকে প্রধান দাবী হিসেবে উপস্থাপন করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকে দ্বিতীয় দাবী করা হয়েছে।

একটি ইসলাম বিরোধী শক্তি দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল থাকলেও এ দেশের মানুষের ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থার কারণে তাদের অগ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্য অদ্যাবধি সফল হয়নি। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ যখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল সেই সময়ও তৎকালীন সরকার প্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান মহানবীর (সাঃ) উদ্দেশ্যে অবমাননাকর কবিতা লেখার জন্য দাউদ হায়দারকে জনমতের চাপে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দাউদ হায়দার জার্মানিতে অবস্থান করে ইসলামের বিরুদ্ধে তার বিষোদগার বাংলাদেশের প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার ও সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আজো সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতা হলো, আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বড় অংশ আবার উল্লিখিত পত্রিকাগুলোকে প্রগতির ধারক-বাহক বিবেচনা করে প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা এবং আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদের মুখোশধারী স্থানীয় মুখপত্রগুলোকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করে চলেছেন। এদিকে আবার ড্রইংরুম আলাপচারিতায় একই মধ্যবিত্ত সুযোগ পেলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। শহুরে মধ্যবিত্তের এই দ্বিমুখী চরিত্র অবশ্য আমাদের অনেকেরই অতিচেনা। বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর তো কথাই নেই। তাদের বিজ্ঞাপন বাজেটের বেশীরভাগ থাকে ইসলামবিরোধী পত্রিকাগুলোর জন্য।

বাংলাদেশের ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো শতধা বিভক্ত হওয়ায় এবং তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে দেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার অভিযোগ থাকায় এ বিষয়ে কোনো শক্ত অবস্থান নিতে বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে। বরং দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক ধরনের আপসকামিতার জন্যই এদের সদাব্যগ্র মনে হয়েছে। এরা সর্বদাই শঙ্কাগ্রস্ত থাকে যে পাছে আবার ১৯৭১ এর প্রসঙ্গ উঠে আসে। উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে নৈতিক শক্তি ব্যতীত কোনো আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মকান্ড করা সম্ভব নয়। ফিরে যাই মূল আলোচনায়।

গত ১৫ নভেম্বর রাতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়টি জনপদের পর জনপদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে তার তুলনা ১৯৭০ সালে বরিশাল ও ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ধ্বংসকারী ঝড়ের সাথেই হতে পারে। এবারের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে বাড়িঘর গেছে, ক্ষেতের ফসল গেছে, চিংড়ি ঘের গেছে, গবাদীপশু গেছে এবং বৃক্ষসম্পদ গেছে। সর্বোপরি, স্মরণকালের ভয়াবহ এই ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে অসংখ্য স্বজন হারানোর মাতম ঘরে ঘরে এখনো চলছে। মৃতের সংখ্যা কত নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না হলেও স্বয়ং রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান বলেছেন, এই সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ১০ হাজারের উর্ধ্বে হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এমন হৃদয়বিদারক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডাররা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে নিউ ডিওএইচএস'র অভিজাত রাওয়া ক্লাবে এক মতবিনিময় সভায়

www.pathagar.com

মিলিত হন। ভুল বুঝবেন না। আলোচনার বিষয়বস্তু দূর্গত বিপন্ন মানুষের ত্রাণকাজ বিষয়ক ছিল না। আলোচনা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধাপরাধের বিচার কার্যক্রম নিয়ে। উপকূলে আমাদের দেশের মানুষের ক্ষুধা নিবারণের অন্ন নেই, পিপাসা নিবারণের জন্য সুপেয় পানি নেই, মাথার ওপর আচ্ছাদন নেই। তাতে সেক্টর কমান্ডারদের বয়েই গেল। পত্রিকার ছবিতে দেখলাম তাদের অনেকেই দামী স্যুট-টাই পড়ে বেশ কেতাদুরস্ত হয়েই আয়োজিত সভায় যোগদান করেছেন। একই দিনে মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদ নামক অপর একটি সংগঠন প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছেন। গোলটেবিলের বিষয়বস্তু হচ্ছে 'একাত্তরের গণহত্যাকারী যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ'।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে একশ্রেণীর ব্যক্তির সব পরিমিতিবোধ বোধহয় লোপ পেয়েছে। নইলে শুকনো জায়গার অভাবে দাফন করতে না পেরে মা তার সন্তানের লাশ পাহারা দিচ্ছে এমন মর্মান্তিক ছবি যে দিন পত্রিকায় প্রথম পাতায় ছাপা হচ্ছে, সেই দিনই আমরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে মতবিনিময় করছি ৩৬ বছরের পুরনো অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে। এসব আলোচনা অনুষ্ঠান একটি মাস পিছিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থটুকু দুর্গত মানুষের মধ্যে বিতরণ করলে কিছুটা মানবিক মূল্যবোধের প্রমাণ মিলত। অবশ্য বিদেশী শক্তির কাছে'দায়বদ্ধতা থাকলে বিচারবুদ্ধির এমন অবস্থা হবে এটিই স্বাভাবিক। যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে এসব ব্যক্তি উজ্জীবিত হয়েছেন এবার তার উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করা যাক।

সেকুলারিজম যাকে বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষতা বলে থাকি সেই দর্শনটি উনিশ শতকে যুক্তরাজ্য থেকে প্রধানত উদ্ভূত হয়েছে। ১৮৪৬ সালে জর্জ জেকব হোলিওক (George Jacob Holyoake) নামক এক ব্যক্তি সেকুলারিজম (Secularism) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ প্রধানত মানুষের ইহজাগতিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত। ইংলিশ সেকুলারিজম এবং প্রিন্সিপল্‌স্ অব সেকুলারিজম অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

১. "Secularism is that which seeks the development of the physical, moral and intellectual nature of man to the highest possible point, as the immediate duty of life- which inculcates the practical sufficiency of natural morality apart from Atheism, Theism or the Bible- which selects as its methods of procedure the promotion of human improvement by material means, and proposes these positive agreements as the common bond of union, to all who would regulate life by reason and enable it by service. (Principles of Secularism, 17)

(ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে মানুষের শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের উচ্চতম চূড়া। এটি নাস্তিক্যবাদ, আস্তিক্যবাদ এবং বাইবেল থেকে ভিন্ন এক ধারণা যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ন্যায়পরায়ণতা জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে। বস্তুভিত্তিক মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া, ইতিবাচক চিন্তাচেতনাকে ঐক্যের ভিত্তি বিবেচনা, যুক্তির মাধ্যমে জীবন পরিচালনা এবং সেবার মাধ্যমে জীবনকে মহিমান্বিত করা এই হলো ধর্মনিরপেক্ষতার নিয়মাবলী)

২. "Secularism is a code of duty pertaining to this life founded on considerations purely human, and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. Its essential

www.pathagar.com

principles are three: The improvement of this life by material means. That science is the available providence of man. That it is good to do good. Whether there is other good or not, the good of present life is good, and it is good to seek that good." (English Secularism, 35)

(ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল মানুষের ইহলৌকিক দায়িত্ব সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অপূর্ণ, অস্পষ্ট, আস্থা স্থাপনের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে এই আদর্শ তাদের জন্য। এর মূল উপাদান তিনটি ঃ এক. ইহলৌকিক জীবনের উন্নয়ন কেবল বস্তুর মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। দুই. বিজ্ঞানই মানুষের জন্য একটি প্রাপ্তিসাধ্য ঈশ্বর। তিন. যে কোন ভালো কাজই ভালো। অন্য কোনো ভালো থাকুক বা না থাকুক বর্তমান জীবনের জন্য যা ভালো তার সন্ধানই শ্রেয়।)

ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাত্ত্বিকমূলক বিশদ বিশ্লেষণ করার মতো গভীর জ্ঞান আমি রাখি না । তবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে আমার মতো অতি সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও এটুকু বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, ইসলাম ধর্ম মতে বিশ্বাসী কোনো মোমিনের পক্ষে উদ্ধৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করা ধর্মবিরুদ্ধ। আমরা বিশ্বাসীরা ইসলামকেই একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করি এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিকে সর্বরকম দ্বিধা এবং তর্কের ঊর্দ্ধে স্থাপন করে থাকি। মহান আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আল বাক্বারার ২৮ নং আয়াতে বলেছেনঃ "কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন । অতঃপর তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।"

শুধু ইহলৌকিক জীবনের উন্নয়নকে মানব জন্মগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য বিবেচনা করা হলে কিংবা পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে কোনোরকম সংশয় সৃষ্টি করা হলে তা যে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীনবিরোধী চিন্তধারা হিসেবেই পরিগণিত হবে এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যারা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান দেখতে চাচ্ছেন তারা যে প্রকৃতপক্ষে ইসলামবিরোধী অবস্থান নিচ্ছেন এটা অনুধাবন করা আমাদের সবার জন্যই জরুরী। এখন সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপ্রবেশ ঘটল কি করে? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে একটু দীর্ঘ পথপরিক্রমা প্রয়োজন। প্রায় পাঁচ দশকের এই পথপরিক্রমায় পাঠকবৃন্দকে সত্য জানার খাতিরে যে বেশ কিছু উদ্ধৃতির অত্যাচার সহ্য করতে হবে সে জন্য আগেই মার্জনা ভিক্ষা করে রাখছি। ফিরে যাচ্ছি ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে।

প্রথমেই যে দলিলটি আমরা বিবেচনা করব তা হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ইংরেজীতে Proclamation of Independence নামে ঘোষিত ও জারিকৃত হয় এবং ২৩ মে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে উপরোক্ত ঘোষণাপত্রে তিনটি স্থানে নিম্নরূপ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ঃ

এক) .....in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice, declare and constitute Bangladesh to be a sovereign People's Republic.....

www.pathagar.com

(বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণার্থ, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম.....)

দুই) .....do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just government.....

(বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন....)

তিন) We further resolve that we undertake to observe and মরাব effect to all duties and obligations that develop upon us as a member of the family of nations; and to abide by the charter of the United Nations.

(আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমন্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের ওপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসঙ্ঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি)

অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে গঠিত গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেননি। যে আদর্শসমূহ ধারণ করে বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠী পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসকশ্রেণী এবং সে দেশের বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল তার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান ছিল না। এটি আমাদের সংবিধানে ঢুকেছে অনেকটা পিছন দরজা দিয়ে। এবার তারই ইতিহাস বর্ণনা। ১৯ মার্চ, ১৯৭২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে বিতর্কিত ২৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ প্রথমবারের মতো নিম্নোক্তভাবে উত্থাপিত হয়ঃ

"Inspired by common ideals of peace, secularism, democracy, socialism and nationalism."

(শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের সার্বজনীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে।)

বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ভাবাদর্শের এই কথিত মিল সম্পর্কে সংশয় থেকেই গেল। কারণ বাংলাদেশে তখন পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো আদর্শ কোনো রকম রাষ্ট্রীয় দলিলেই গৃহীত হয়নি। তবে, ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার সাথে উপরোক্ত বক্তব্যের বিস্ময়কর সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বরে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ ঃ

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic."

(আমরা, ভারতের জনগণ সশ্রদ্ধচিত্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।)

www.pathagar.com

এবার তদানীন্তন পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক ২১ দফার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন যুক্তফ্রন্টের যে ২১ দফা প্রণয়ন করা হয়েছিল সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো উল্লেখ তো ছিলই না বরং পবিত্র কুরআন ও সুন্নামাফিক রাষ্ট্র পরিচালনার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। উল্লিখিত ২১ দফা আরম্ভই করা হয়েছিল 'নীতি' শিরোনামে নিম্নে উদ্ধৃত প্রস্তাবনার মাধ্যমে।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

'নীতি ঃ কুরআন ও সুন্নার মৌলিক নীতির পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।'

এমনকি পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবি সম্বলিত পুস্তিকায় এই উপমহাদেশের ১৯৪৭-পূর্ব ভৌগোলিকভাবে আজকের বাংলাদেশ অংশটিকে মুসলিম বাংলা নামে অভিহিত করা হয়েছে। মরহুম শেখ মুজিবর রহমান স্বাক্ষরিত উপরোক্ত পুস্তিকায় একাধিকবার যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রসঙ্গ এসেছে এবং ১৯৬৬ সালের ৬ দফাকে ১৯৫৩ সালের ২১ দফারই ধারাবাহিকতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ ভারত মৈত্রি চুক্তির আগে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বও যে ইসলামকে বিসর্জন দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল এমন প্রমাণ মিলছে না।

ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে পরিস্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপ্রবেশ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে তৎকালীন নেতৃত্বের নতি স্বীকারের ফলেই ঘটেছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়ে স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যেই যে ভালো রকম দ্বিধা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৭৪ সালে দিল্লির প্রকাশ্য অসন্তোষ সত্ত্বেও লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। পরে ১৯৭৭ সালে এক ফরমানের মাধ্যমে (Proclamation Order No. 1 of ১৯৭৭) বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বর্জণ করে সেখানে বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম (Bismillah-Ar-Rahman-Ar-Rahim) এবং দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে (In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful) লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ১৯৮৮ সালের ৯ জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে (The Constitution Eighth Amendment Act, 1988, Act XXX of 1988) রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম গৃহীত হয় ঃ

অনুচ্ছেদ-২ কঃ রাষ্ট্রধর্ম- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম ও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।

১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে গৃহীত সংবিধানে বিদেশী শক্তির চাপে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার ইসলামবিষয়ক নীতি থেকে যে বিচ্যুতি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই ঘটানো হয়েছিল অনেক পথ পরিক্রমা শেষে সেখান থেকে আজ রাষ্ট্রের উত্তরণ ঘটেছে। আজকে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে প্রত্যাবর্তনের নামে যখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে আবার রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চান তখন প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় আধিপত্যবাদের কাছেই আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেটি দেশের স্বাধীনতাপ্রেমী নাগরিকদের না বোঝার কোনো কারণ

www.pathagar.com

নেই।

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার উপরোক্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি সরাসরি ভারত থেকে আমদানিকৃত। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তির পর ভারতীয় নেতারা তাদের সংবিধান রচনাকালে জর্জ জেকব হোলিওকের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিনা সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ এবং আমার আজকের লেখাবহির্ভূত বিষয়। তবে বাস্তবতা হলো, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার ডংকা বাজানো হলেও সে দেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নের মাত্রা কমার কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানীদের নজরে আসেনি। ভারতে আবহমানকাল থেকে চলমান জাতিভেদ প্রথার নির্মম শিকার দলিতদের অবিসংবাদিত নেতা ড. বি আর আম্বেদকর থেকে শুরু করে হালের বিখ্যাত সমাজবাদী বিশ্লেষক আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত ভারতের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আক্ষেপ করে চলেছেন। উল্লিখিত দুই বিখ্যাত জনের নিম্নোক্ত দু'টি উদ্ধৃতি আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশটির কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপটি উপলব্ধির জন্য সহায়ক হবে।

There have been many Mahatmas in India whose sole object was to remove Untouchabilities and to elevate and absorb the depressed classes; but every one of them has failed in his mission, Mahatmas have come, Mahatmas have gone. But the Untouchables have remained as untouchables.' Dr. B.R. Ambedkar.

(ভারতে অনেক মহাত্মাই ছিলেন যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং দেশের হতোদ্যম শ্রেণীকে সমাজে গ্রহণ করে তাদের অবস্থার উন্নয়ন করা। কিন্তু, তারা প্রত্যেকেই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। মহাত্মারা এসেছেন এবং গেছেন। কিন্তু, অস্পৃশ্যরা অস্পৃশ্যই থেকে গেছে। ড. বি আর আম্বেদকর)

'India could not free itself of curse of communalism even more than fifty years after independence. If anything it has been getting worse year after year. These has been not a single year in post-independence period, which has been free of communal violence though number of incidents may vary.' Asghar Ali Engineer.

(স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের অধিককাল পরও ভারত সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে বছরের পর বছর অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একটি বছরও সাম্প্রদায়িক সহিংসতামুক্ত থাকেনি যদিও এ জাতীয় ঘটনার সংখ্যায় তারতম্য থাকতে পারে। আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার)

চরম বাংলাদেশবিরোধী ব্যক্তিও সম্ভবত স্বীকার করবেন যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের দেশ বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গত ৩৬ বছরের ইতিহাস তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের চেয়ে বহু গুণে উজ্জ্বল। এতদসত্ত্বেও প্রশ্ন করা যেতে পারে বাংলাদেশের একশ্রেণীর নাগরিকের ইসলামের প্রতি এত বিস্ময়কর বিদ্বেষ কেন?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদের বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন-মানসিকতার মধ্যেই খোঁজা আবশ্যক। আমি নিজে এই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কারণে শহুরে মধ্যবিত্তের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বিষয়গুলো আমার অতি চেনা। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে ছাত্রজীবন থেকেই এক ধরনের

www.pathagar.com

হীনমন্যতার মধ্য দিয়েই আমাদের অধিকাংশের বেড়ে ওঠা। না পাওয়ার হতাশার মধ্যেই জন্ম নেয় যত দ্রুত সম্ভব কেউকেটা হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। জাতে ওঠার দু'টি পথ আমাদের শ্রেণীর সামনে খোলা থাকে। প্রথমটি হলো নৈতিক-অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ধনবান শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া। টাকা রোজগার তুলনামূলকভাবে কঠিন হওয়ার ফলে প্রগতিবাদের সহজ রাস্তায় আমাদের ধাবিত হওয়ার প্রবণতা অধিক থাকে।

প্রগতিবাদী হতে হলে ধর্মকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেই হবে এটিও শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত মানসের আর এক কূপমণ্ডুকতা। ইসলাম সম্পর্কে কটুবাক্য না লিখলে অথবা বললে আবার বর্ণহিন্দু অধ্যুষিত কলকাতার পিঠ চাপড়ানি মিলবে না। স্বল্প মেধা এবং মননসম্পন্ন ব্যক্তি শুধু ইসলামবিরোধিতার জোরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন এমন উদাহরণের তো অভাব নেই।

ধারণা করছি, এই মানসিকতাও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি। ১৯৪৭ সাল-পূর্ব পরাধীন সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষ প্রধানত বর্ণ হিন্দুদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। তখন এই শ্রেণী একে সংখ্যাগুরু তার ওপর ইংরেজ শাসকশ্রেণীর স্থানীয় দোসর। সেই ক্ষমতাবানদের মন জয় করে টিকে থাকার জন্যই হয়তো মধ্যবিত্ত মুসলমানকে তার নিজ ধর্মকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে নানা কৌশলে।

দুইশ' বছরের পরাধীনতার গ্লানির ফলে ১৯৪৭ সালে একবার এবং ১৯৭১ সালে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা লাভ করেও বাঙালি মুসলমান তার পুরানো হীনমন্যতার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়নি। আমার বিভিন্ন লেখায় প্রসঙ্গিকভাবে পবিত্র কুরআন শরীফের উদ্ধৃতি থাকার ফলে এই বিশেষ শ্রেণীভুক্তদের কাছে আমি ইতোমধ্যেই মৌলবাদীরূপে পরিচিতি লাভ করেছি। এটিকে তারা সংস্কৃতিবান মধ্যবিত্তের স্খলন এবং বিচ্যুতি হিসেবেই বিবেচনা করে থাকেন।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পুরনো সব দুর্বলতার সাথে এখন আবার যুক্ত হয়েছে ইয়াবা, ডি'জ্যুস এবং আকাশ সংস্কৃতির কল্যাণে ভারতীয় সোপ অপেরার চোখ ধাঁধানো আগ্রাসন। যে তরুণ সমাজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অকুতোভয়ে সামনের কাতারে এসে দাঁড়াবে তাদের লক্ষ্য করেই সুকৌশলে এ জাতীয় মগজ ধোলাই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক নেতারাও কোনো রকম আদর্শ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আজকের কঠিন পরিস্থিতিতে তারা মেরুদন্ডহীন, সুবিধাবাদী এবং দূরদৃষ্টিবিহীন এক দুর্বল গোষ্ঠী হিসেবেই জাতির কাছে প্রতিভাত হচ্ছেন। আমাদের মতো পঞ্চাশোর্ধ প্রজন্মও তাদের তেমন কোনো নৈতিকতার উদাহরণ দিয়ে বর্তমান প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে পারছে না। বিদেশী শক্তির স্থানীয় ধারক-বাহকরা মনে করেছে চূড়ান্ত আঘাতের জন্য এটিই প্রকৃষ্ট সময়। দুর্বল জাতিকে অধিকতর দুর্বল করার জন্যই এখন নতুন করে বিভাজন সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর অবতারণা। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশের প্রবলভাবে ধর্মবিশ্বাসী, সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষই আমাদের ভরসাস্থল। ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে মহান মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগই এসেছিল এই শ্রমজীবী শ্রেণী থেকেই। ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতেও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তারাই এগিয়ে আসবেন। এই প্রত্যাশা অন্তরে লালন করেই শেষ করছি আজকের কথকতা।

দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৮ নভেম্বর ২০০৭

লেখক ঃ সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ উপদেষ্টা এবং বিনিয়োগ বোর্ডের সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

স্বাধীনতার সংকট

।। আহমদ ছফা ।।

[আহমদ ছফার এ অপ্রকশিত লেখাটি ১৬ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের বিশেষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ লেখাটি সংগ্রহ করেন জনাব নূরুল আনোয়ার লেখাটির শুরুতে সংগ্রাহক লিখেছেনঃ
আহমদ ছফা সাহসী পুরুষ- সেকথা আমরা কম-বেশি সবাই জানি। কিন্তু 'গণকণ্ঠ'-এ লেখা রচনাগুলো পাঠ না-করলে আহমদ ছফার সাহসের দিকটা পুরোমাত্রায় বিশ্লেষণ করা অনেকটা উহ্য থেকে যাবে। ওই সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজে অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, গঞ্জনা, অন্যায়, অবিচার, খুন, লুট, ডাকাতি, রাহাজানি, দুর্নীতি এতবেশি বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি প্রতিনিয়িত কলম ধরে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রতিবাদী আহমদ ছফা প্রতিবাদ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু লেখাগুলো কেবল প্রতিবাদ নয়, যেন একেকটা বিদ্রোহ। লেখাগুলো পড়ে কেউ যদি আহমদ ছফাকে 'বিদ্রোহী লেখক' হিসাবে আখ্যায়িত করেন, তাঁকে কোনভাবেই দোষ দেয়া যাবে না।]

আমাদের দেশের এই যে পরিস্থিতি একে সমাজ-বিজ্ঞানের ভাষায় একটা সংকটকাল বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তখনই একটা কাল সংকটের সম্মুখীন–যখন মানবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যার কোন সহজ সমাধান অসম্ভব এবং সেগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা ওতপ্রোতভাবে মিলে-মিসে একটা যুগে মানুষের ভদ্র জীবনযাপন প্রায় অসম্ভব করে তোলে। সকলেই স্বীকার করবেন, এমন কি সরকার বাহাদুরের মন্ত্রী বাহাদুরেরা পর্যন্ত সভা-সমিতিতে বলে থাকেন আমাদের খাদ্য-সংকট, বস্ত্র-সংকট, ওষুধ-সংকট, শিক্ষা-সংকট এবং সর্বোপরি চরিত্র-সংকট বড় তীব্রভাবে দেখা গিয়েছে।

সরকারি নেতা এবং মন্ত্রী বাহাদুরেরা স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে এই সংকটকে চিনে নিয়েছেন তা সত্যি নয়। সংকট নিজেই তীক্ষ্ণভাবে গুঁতো দিয়ে চিনিয়ে দিয়েছে–এই যে আমরা আপনাদের রাজত্বে দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করছি এবং আপনাদের ঝাড়ে বংশে নির্মূল না-করা পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করতেই থাকব। কেমন করে একটু বলি। একবার ধরুন, একটা ডাকাতের দল ধরা পড়ল। পুলিশ থানায় নিয়ে তাদের নাম এবং পিতৃ নাম জিজ্ঞেস করে আবিষ্কার করলেন যে, এরা সব রাজপুত্রের দল। আরেকবার ধরুন ধরা পড়ল, আরেক দল চোরাচালানি, এবার পুলিশ আরো সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলো যে, এরা সকলেই পূর্বোক্ত রাজ-পুরুষদের বশংবদ আত্মীয় এবং ভাইয়ের দল। ঐভাবে ধরা পড়তে থাকল। এসব খবর কতদিন আর গোপন থাকে। পত্রিকায় কানাঘুষো চলছিল প্রথমে, তারপর খবর ফলাও করে ছাপা হতে থাকল। এবার রাজ-পুরুষেরা বাধ্য হয়ে স্বীকার করলেন, হ্যা, এটা সংকটকাল–নইলে আমাদের ছেলেপুলে, ভাইপো, ভাগ্নে, যাদের অঢেল খাওয়ার-পরবার আছে তারা কেন এ জাতীয় অভব্য কাজে অংশ নেবে বা নেতৃত্ব দেবে। এরকমভাবে অন্যান্য সংকটও তাদের

www.pathagar.com

বিরাট বিরাট শরীর নানা অছিলায় রাজ-পুরুষদের দেখাতেই থাকল।
প্রথমে এসব শুনে তারা চটে যেতেন, তাদের বন্ধুরা আরো বেজায় চটতেন, একবাক্যে বলে দিতেন–এসব চীন এবং পাকিস্তানের অনুচরদের স্বাধীনতা বিনাশী ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। বলতেন, জনগণের প্রাণপ্রিয় দাবি সমাজতন্ত্রকে বানচাল করার জন্যই নেহায়েৎ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব প্রচার করা হচ্ছে। সেই সরকার এবং তার কনিষ্ঠ অংশীদারটি মিলে যখন সমাজতন্ত্র বাংলাদেশে পুরোপুরি পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল, সংকটগুলোও সাবালক হয়ে চোরাগলি থেকে রাজ-পুরুষদের সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যে আমরা।'

তারপর থেকে সমানেই খাদ্য-সংকট, বস্ত্র-সংকট, ওষুধ-সংকট, শিক্ষা-সংকট, যুব-সংকট ইত্যাদি সংকটমালার নাম করে সরকারি বেসরকারি সমস্ত মানুষ তার স্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। ফাঁদে ধরা ইঁদুর যেমন যত নড়াচড়া করে তত ফাঁসটা শক্ত হয়ে আটকায়, তেমনিভাবে উপকথার দৈত্যের মত সংকটের শরীর তাদেরই চোখের সামনে প্রসারিত হতে হতে বঙ্গোপসাগরের মতন বিশাল আকার ধারণ করল। রাজ-পুরুষেরা সকলে ধৈর্য এবং দেশপ্রেম দিয়ে জনগণকে এই সংকটের মোকাবেলা করার জন্য উদাত্ত আহবান জানালেন–শুনে সংকটেরা মুচকি মুচকি হাসল। রাজ-পুরুষদের মধ্যে যিনি জন্মগতভাবে রাজচক্রবর্তী মনে করেন। তিনি হুংকার ছাড়লেন এবং প্রচণ্ডভাবে ধমক দিলেন, এইবার সংকটেরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কারণ যে সমস্ত রাজ-পুরুষ জাতীয় সংকট রোগের চিকিৎসকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন ও কর্মকর্তার কল্যাণ হয়েছে এবং কিছু কিছু শিল্প-কারখানা, সিনেমা হল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকদেরও কল্যাণ হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ কল্যাণ যে কতটা হয়ে তা হলফ করে বলা মুশকিল। এই ট্রাস্টের তরফ থেকে কিছু মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সাহায্য করা হচ্ছে বটে, কিন্তু মোট মুক্তিযোদ্ধা পরিমাণের তুলনায় এই সাহায্য-প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা উল্লেখেরও অনুপযুক্ত।

ক্ষমতাসীন সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এই সুপরিকল্পিত অবহেলার দ্বারা জাতির সংগ্রামী চেতনাকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু এটা কতটা সম্ভবপর হবে তা প্রমাণ করবে আগামী দিনের আন্দোলনের ইতিহাস।

পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত বাঙালিদের ব্যাপারেও সরকারি অনীহা একান্ত দুর্ভাগ্যজনক। পাকিস্তান আমলে যেহেতু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং সামরিক বাহিনীসমূহের হেডকোয়ার্টার্স ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, সেহেতু কয়েক লক্ষ বাঙালি কার্য উপলক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। এদের অধিকাংশই শুধু উচ্চপদস্থ ও দায়িত্বশীল কর্মচারীই ছিলেন না; উপরন্তু ফেডারেল সরকারের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন। স্বভাবতই প্রশাসনসহ অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি দফতরের কার্যকারিতা শক্তির হাত থেকে স্বাধীন হলে কতগুলো অনিবার্য সংকট আপনা-আপনি দেখা দিয়ে থাকে। পরিচালনা শক্তি যতই সুদক্ষ হোক-না কেন, এ সংকট অনিবার্যভাবে এসে থাকে।

www.pathagar.com

কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কিছু সময়ের পরে সে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র যখন নিজস্ব একটা কক্ষপথ তৈরি করে ফেলে আস্তে আস্তে সেগুলোর বিলয় ঘটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চলে গেলে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে এ রকম একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তারপরে ভারত-পাকিস্তানে শান্তি ফিরে আসে এবং জনজীবনে যতই অপ্রচুর হোক-না কেন, এক ধরনের নিশ্চিন্তবোধ এসেছিল। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বেলায় বিশৃঙ্খলা, সামাজিক শক্তিগুলো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সঞ্জাত নৈরাজ্য অনেক সময় চরম রূপ পরিগ্রহ করে। কেন না, যেখানে একটি দল সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে আরেকটি দলকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করে এবং শোষকদের সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রটা শোষিতদের দখলে নিয়ে আসার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। তার ফলে কিছু দিন সমাজের বড়ই অগোছালো, বিশৃঙ্খল এবং এবড়ো-থেবড়ো অবস্থায় থাকে। এমনও হয়ে থাকে, কোথাও কোথাও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি মুখ্যশত্রুকে পরাজিত করার পর সমস্তটা আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবার জন্য বছরের পর বছর লড়াই করতে হয়। কিন্তু একটি কথা সত্য যে, ক্ষমতার পালাবদলের প্রাথমিক পর্বের নৈরাজ্যের মধ্যেই জনগণের সুখী এবং সমৃদ্ধ জীবনের প্রতিশ্রুতি আত্মগোপন করে থাকে। ক্রমশ জনগণের শক্তি প্রতিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে সংহত থাকে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং জনগণের জীবনে সমৃদ্ধি ফিরে আসে।

আমাদের দেশে কি ব্যাপার ঘটেছে–সেদিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। উনিশশ' একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বরের পরে ভারতীয় বাহিনীর পেছন পেছন আওয়ামী লীগের লোকেরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে ক্ষমতার আসনে গাঁট হয়ে বসে। তাদেরকে দেশের অভ্যন্তরে কোনো রকমের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। পাছে অন্যরকম কোনকিছু ঘটে–এ জন্য অনেকদিন পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনী তাদের চারদিকে পাহারা দিয়েছে। নিরুপদ্রবে যাতে একটি দল রাজ্য ভোগ করতে পারে, সে জন্য প্রকৃত সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের অনেককেই কারাগারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। পার্টির লোকেরা দেশে প্রবেশ করে মনের আনন্দে গুলি ছুঁড়ছে, অনেক সময় দেশের নাম করে ব্যক্তিগত শত্রুদের নিঃশেষ করে দেবার জন্য এবং বিহারিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করার জন্য রাইফেল, এলএমজি'র ব্যবহার করলে বিরোধিতার কারণে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার তাদের একেবারেই করতে হয়নি। পাকিস্তানি সৈন্যদের আগেই ভারতে চালান করে দেয়া হয়েছে এবং কলাবরেটররা অনেকে ধরা পড়েছে এবং অনেকে সঙ্গে সঙ্গেই মারা পড়েছে। তবু টু-শব্দটি উচ্চারণ করার কোন মানুষ ছিল না। তারা ইচ্ছেমতো লুট-পাট করেছে। পরিত্যক্ত বাড়িঘর যার যা পছন্দ হয়েছে দখল করে নিয়েছে। গাড়ি-ঘোড়া যা পেয়েছে নিজেরা নিয়ে নিয়েছে। দেখা গেল, উনিশ শ' একাত্তরের আগে যাদের ধন-সম্পদ চরিত্র এবং বিদ্যা এসবের কিছুই ছিল না, বাহাত্তরের মধ্যে দেখা গেল তারা একেকজনে দু'তিনটা করে প্রাইভেট কার রাখে, চার পাঁচটা করে বাড়ির মালিক এবং নগদ টাকার অন্ত নেই। শুধু লুট-পাট নয়, সরকারি আইনের সুযোগ নিয়ে লাইসেন্স পারমিট ইত্যাদি বাগিয়ে দলের নিরীহতম মানুষটিও টাকার গাছে পরিণত হয়েছে।

এরা একবার উনিশ শ' একাত্তর সালে তথাকথিত অসহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিহারিদের গাড়ি-বাড়ি, টাকা-পয়সা লুট করেছে, তাদের হত্যাত করেছে। তাদেরই একাংশ পাকিস্তানি সৈন্যের

www.pathagar.com

আক্রমণের পর ব্যাংক এবং ট্রেজারির কোটি কোটি টাকা লুট করে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। এই আওয়ামী লীগের আরেকটি ক্ষুদ্র অংশ দেশের ভেতরে থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তা করেছে। আর কেউ কেউ ভারতীয় সৈন্যের পিছু পিছু দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাড়ি-গাড়ি দখল, দোকান-পাট হস্তগত করা থেকে শুরু করে নারী নির্যাতন পর্যন্ত সমস্ত কাজ অবলীলায় সম্পন্ন করে দেশপ্রেমের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এতেও শেষ নয়। দেশের যা কিছু সম্পদ যেমন পাট, চামড়া ইত্যাদি এবং অন্যান্য জিনিস অবশিষ্ট ছিল রাতারাতি ভারতে পাচার করে দিয়ে বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করল। দেশে কল-কারখানা নেই বিশেষ, তবু অল্প-সল্প যা আছে তার যন্ত্রপাতি খুলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দিল। আওয়ামী লীগাররা যেখানেই হাত দেয় সোনার বাংলার সোনা তাল তাল তাদের হাতে উঠে আসতে থাকল। এত লুট তবু সোনার বাংলার সম্পদ ফুরায় না। তারপরও কল-কারখানা যেগুলো ছিল সেগুলোতে ধরে ধরে নিজের দলের লোকদের চালক বানিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিকল করে দিল। বাস্তবিকই পল্টনের এক হুংকারে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ক্রিয়া চালু করার ভার যাদের ওপর দেয়া হল তারা নিজেরা লুট করল, কারণ তাদের একমাত্র লুটের অভিজ্ঞতাই আছে। কল-কারখানা চালাবার অভিজ্ঞতা তাদের কস্মিনকালেও ছিল না। এই বেপরোয়া লুটপাটে পাছে কর্তাব্যক্তিরা রাগ-বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাই কর্তাদের আসা-যাওয়ার পথে শ্রমিকদের দিয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেয়াবার ব্যবস্থা করলেন। কর্তারা খুশি হয়ে ব্যাংক থেকে তিন মাসের মাইনে আগাম দেয়ার নির্দেশ দিলেন, ও-দিকে কলকারখানা বন্ধ রইল তো রইলই। দেশে টাকা-পয়সার দারুণ অভাব, তাই বস্তা বস্তা কাগজের নোট ছেপে বাজারে ছেড়ে দেয়া হল। টাকা ছেপে বাজারে চালু করার খেলাটি এতই চমৎকার যে, আমাদের ভারতীয় বন্ধুরাও তাদের দেশে মুদ্রিত এক টাকার অনুকরণে জাল নোট তৈরি করে বাংলাদেশের বাজারে ছেড়ে দিলেন। তাঁরা দীর্ঘ নয় মাস কালব্যাপী বাংলাদেশ সরকারে আতিথ্য দান করেছে, রাজনৈতিক নেতা এবং মন্ত্রী মহোদয়দের সেবা করেছে, নিশ্চয়ই তাঁদের সে অধিকার আছে।

এসব নিয়ে কেউ যদি হ্যাঁচ্ছো করত, অমনি বলা হত কলাবরেটর, রাজাকার, আলবদর, চীন এবং পাকিস্তানের গুপ্তচর। কল্পনায় তখন একটা মুসলিম বাংলার জন্ম দিয়েছিলেন। সরকারের কোন নীতি এবং কার্যপদ্ধতির কোন সমালোচনা করলেই তার নির্ঘাৎ মৃত্যু। বিচারকেরা আদালত পর্যন্ত টেনে নেবার কষ্টও স্বীকার করবে না। এত নির্ভুল বিচারক। 'গণকণ্ঠ', 'হক-কথা', 'লাল পতাকা', 'স্পোকসম্যান', 'মুখপত্র', ইত্যাদি পত্রিকা একটু একটু করে সত্য কথা বলার জন্য মুখ খুলছিল, আওয়ামী লীগ সরকার পত্রিকাগুলো এবং সংশ্লিষ্ট সম্পাদকবৃন্দের কি অবস্থা করেছে আশা করি দেশের মানুষ সে বিষয়ে ওয়াকেবহাল আছেন। সরকার যখন এ সকল মহৎকর্ম নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছিল তাদের জুনিয়র পার্টনারটি পরমানন্দে বগল বাজাচ্ছিল। তারা বলল, ঠিক করছে সরকার। যারা ভারত এবং রাশিয়ার সদিচ্ছাতে বিশ্বাসা করে না তারা অতি খারাপ লোক–এত খারাপ যে নিশ্চয়ই আলবদর, রাজাকার মুসলিম বাংলা এবং চীনের দালাল না হয়ে যায় না। তাদের ভাষায়ঃ একমাত্র আমরা এবং আমাদের পাছায় কড়া লাথি মারতে পারে সে সরকার ছাড়া আর সকলেই সমাজতন্ত্র এবং স্বাধীনাতার ঘোর শত্রু।

লেখক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

"…. বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতাটি কী তা অন্ধ ও বধির এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি ছাড়া যেকোনো সুস্থ মানুষের অজানা নয়। অর্থনীতি বিপর্যস্ত, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং প্রতিদিন বাড়ছে, তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ্য করে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রেখে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবন থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে একটি বছর, কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয় - আগামী বছর ভাত জুটবে কি না কেউ জানে না, শিল্প-শ্রমিক বেকার, আন্তর্জাতিক চাপ ও চক্রান্ত সর্বকালের মধ্যে এখন সর্বাধিক, জাতির টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষার সব দায়দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও যৌথ বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত দেশপ্রেমিকেরা শুধু গোলটেবিল বৈঠক করলে জাতির সর্বনাশ অবধারিত।….."

-সৈয়দ আবুল মকসুদ, দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ নবেম্বর, ২০০৭

●●● ●●●

"…. সবগুলো অপশক্তিই বর্তমানে আমাদের গণতন্ত্রের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাড়িয়েছে। তারা সম্মিলিত শক্তিতে যে প্লাবন সৃষ্টি করেছে তাতেই আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, কেউ কেউ তলিয়েও যাচ্ছি। অথচ সাহস করে দাড়িয়ে পড়লে দেখতে পেতাম, এখানে মাত্র হাটু বা কোমর পানি। সাতার জানে না এ ভয়ে কোমর পানিতে অনেকেই নাকি ডুবে মরেছে। আমাদেরও আজ একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। চিহ্নিত কয়েকটি পত্রিকা ও কয়েকটি টিভি চ্যানেলের সর্বাধিক ৫০০ মানুষের বুদ্ধি ও কৌশলের কাছে সারা দেশের প্রজ্ঞা ডুবে যেতে বসেছে। …."

-মিনার রশিদ, দৈনিক যায়যায়দিন, ১৬ নবেম্বর, ২০০৭

বিনিময় মূল্য ঃ ৩০ টাকা মাত্র